ঊষা।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ

ঊষা।

শ্রীবিনোদবিহারি বিদ্যাবিনোদ

প্রণীত।

সন ১৩১৭সাল

মূল্য ৸০ বার আনা

গুপ্তপ্রেশ,

শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

উৎসর্গ।

শ্রীমান্ শশধর মিত্র

সোদরপ্রতিমে।

প্রিয় চেক্

তোমার সেই অনেক দিনের হিমালয়গিরি-মধ্যস্থ কাটমাণ্ডুসহরের নিভৃত রেসিডেন্সির "দুগ্ধং পিবতি মার্জারঃ" এতদিনের পর এই জনসমাকীর্ণ বাঙ্গালাদেশে আসিয়া দেখাদিয়া ফেলিযাছে। তোমার মার্জার যখন দুগ্ধং পিবতি তখন জানিও এত লোকের হাতে তাহার আর রক্ষা নাই। লাঠী নিশ্চিত। তুমি তোমার মার্জার লও আর দেখ উহা দুগ্ধং পিবতিই থাকিবে কি লাঠীং খাওতি হইবে। আমি খালাস।

লেখক।

নিবেদন।

উষা উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। কালাপাহাড়, সুলেমান, খানজাহান, মুকুন্দদেব, মানসিংহ প্রভৃতি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের উল্লেখ থাকিলেও ইহা খাঁটি গল্প। ইতিহাসে বলে সুলেমান কিরাণীর সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যা আক্রমণ, তেলিঙ্গা মুকুন্দদেবকে পরাজয় ও জগন্নাথ প্রভৃতি উড়িষ্যার দেবমূর্ত্তিনিচয়ের নিগ্রহ করিয়াছিল। ভিত্তি এই, কিন্তু গঠন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কালাপাহাড়ের যে রাজু বলিয়া একটী নাম ছিল তাহা ইলিয়ট্‌ সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে। (Elliot's history of India, vol VI P 41) আকবরের বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা অধিকারের সহিত মানসিংহের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সম্বন্ধ উপন্যাসের উপযুক্ত করিয়া দেখান হইয়াছে।

আসল কথা ইহার সব শরীরটাই নকল। নকলে আসল করিতে চেষ্টা করিয়াছি শুধু প্রাণ। গুটিকতক প্রাণ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাহি করিয়া বসিয়াছে ইহাই ইহার আসল। কথাটা মস্ত বড়, ছোট মুখে শোভা পাইবার নহে তাহা জানি। আর জানি সংসারে আসলেই যাহা বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায়না, এ নকলে তাহা দেখাতে যাওয়া দুরাশা। কিন্তু কি করিব এ পোড়া কপালের দোষে ইহাতে উহা ছাড়া আর কিছুই নাই। তবে ভরসা এ দেশের মনস্বিতা। "ইহ প্রাণাঃ" বলিয়া এ দেশে প্রতিমায় প্রাণ দেখিতে পায়। আমার অদৃষ্টে তাহা ঘটিবে কি ?

ভট্টপল্লী,	}	বিনীত
১৩১৭, অগ্রহায়ণ	}	লেখক।

উষা।
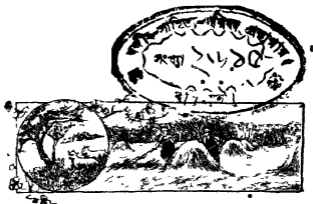
প্রথম পরিচ্ছেদ।

সাগরসঙ্গমে।

'এ কি! এ কি দেখিলাম!' সমুদ্রবীচিবিধৌত ঐ তটভূমিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটী পথিক বলিয়া উঠিল,—'এ কি! এ কি দেখিলাম! বেচারি আর কখন সমুদ্র দেখে নাই। আজ পথে চলিতে চলিতে এই গঙ্গাসাগরসঙ্গমে হঠাৎ উহা দেখিতে পাইয়া একেবারে যেন বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িল তাই মনের আবেগে বলিয়া উঠিল,—"এ কি! এ কি দেখিলাম!" তারপর দাঁড়াইয়া দেখিতে দেখিতে মনের সে প্রথম আবেগ কতকটা প্রশমিত হইলে যখন স্থিরচিত্তে উহার চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল তখন ভাবিল এই কি সেই গঙ্গাসাগরের সাগর!!' ইহারই এক প্রান্তে আশ্রয় পাইবার

জনাই কি ঐ হিমালয়ের গঙ্গা ঐ অত বেগে অত কাতরে এই এতদূর ছুটিয়া আসিয়াছেন ! তা বটে, ইহার জন্য অত কাতর হইবার কথাই বটে। যে জানে জলধি কি কত মহান্ সে ইহার জন্য এমনিই পাগল হইতে পারে বটে। আছে কে? এই সমুদ্র আজ ইহাকে দেখিয়া আমার মনে হইতেছে ইহা অপেক্ষা আর মহান্ আছে কে? এই যে দেখিতে পাইতেছি ঐ আকাশ, যাহাকে এত দিন ধরিয়া আমি প্রবাহের আদর্শ বলিয়া মনে করিতাম, আজ দেখিতে পাইতেছি তাহাও এই ইহার অঙ্ককোণে শয়ান জানি না সেই এই পারাবার হইতে আর মহান্ আছে কে? [illegible]শ হইয়াছে, আজ আমার বড় সুদিন তাই আমি আজ এই গঙ্গাসাগরে আসিয়া পড়িয়াছি। বড় ভাল হইয়াছে। আমি ইহাই খুঁজিতেছিলাম আমি এইরূপই একটী বিশাল বস্তুর অনুসন্ধান করিতেছিলাম যাহাতে সেই সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ বিরাট পুরুষের সেই অনির্ব্বচনীয় বিশালতার ছায়া আছে দেখিয়া, মনে কর যাইতে পারে তুমি এমন একটী জাগতিক বিশাল বস্তুর অনুসন্ধান করিতেছিলাম যাহার বিশালতাকে ভাবিতে পারি এবং আমার সেই মহতে মহীয়ানের আদর্শ। [illegible] এইতো সেই।

পথিক এক দৃষ্টে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সাগরের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর আপন ভাবিতে লাগিল, এই বটে যদি শিখিতে হয় যদি অনন্তের [illegible] অনন্তের মাধুর্য্য বুঝিতে হয় যদি [illegible] আনন্দে বিভোর হইতে হয় তবে এই পারাবারেই আত্মসমর্পণ করিতে হয়। আমি তাহাই করিব আমি ইহাকেই মহত্ত্বের গুরু করিব ইহারই বিশালতা দেখিয়া দেখিয়া প্রাণ প্রশস্ত করিতে চেষ্টা করিব। পথিক সোৎসাহে পদচারণা করিতে লাগিল।

ক্রমে সায়ংকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন পথিক দেখিল ঐ সহস্ররশ্মি যিনি অপার অপরিমেয় বোধে আকাশকে আশ্রয় করিয়া-

ছিলেন বলিয়া আপনাকেও অনন্ত ভাবিয়া•এই এতক্ষণ এই মাটীর পৃথিবীর উপর সদর্পে আপনার গৌরব প্রভা ছড়াইতেছিলেন তিনিও তাঁহার এই অন্তিম সময়ে আপনার সহস্রকিরণে আকাশের সর্ব্বাবয়ব জড়াইয়া ধরিয়াও আপনাকে বাচাইতে না পারিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার আশ্রয়গ্রাসী এই জলধির জলে শয়ন করিতে যাইতেছেন। পথিক সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিল সংসারের ঐ উজ্জ্বল চক্ষু এক অনন্ত পরিহার করিয়া অপর অনন্তে আত্মসমর্পণ করিল। হরি বোল্ হরি।। সূর্য্য জলধিগর্ভে অস্তমিত হইল।।। পথিক আহ্লাদে পুলকিত হইল, ভাবিল না জানি আমার এ পারাবার কত মহান্! তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমুদ্রের বিশালতার বিষয় মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে বসিয়া পড়িল।

এমন সময় এ কি! খানিক পরে পথিক চক্ষু চাহিয়া চমকিত হইয়া উঠিল দেখিল মুষলধারায় পতিত অঞ্জনের ন্যায় ঐ রাশীকৃত তিমিরে পারাবার সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। ভাবিল এ আবার কি! এই যাহাকে দেখিয়া প্রাণ উধাও হইয়া যাহার সাহিত অনন্তে মিশিয়া যাইতে চাহিল এই যাহাকে মহত্তা মহীয়ানের আদর্শ বলিয়া মহত্ত্বের গুরু করিলাম সেই এই সমুদ্রেরও এমন অবস্থা হইয়াছে। অমন যে মহান্ তাহারও মহতী সত্তা অন্ধকারের অন্তর্নিহিত হইয়া গিয়াছে। বড় আশ্চর্য্য। এই নিকটে জলকল্লোল শুনা যাইতেছে, এই হু হু করিয়া বাধাশূন্য বাতাস আসিয়া সর্ব্বাঙ্গ কাঁপাইয়া দিতেছে, সমুদ্র যে না দেখা যাইতেছে তাহা তো নহে, কিন্তু কই পারাবার তো দেখা যাইতেছে না? এই যে ইহার সেই বিশালতা অন্ধকারে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে এ যে এই দৃষ্টির সম্মুখে বড় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তবে আর কেমন করিয়া ইহাকে গুরু করি। গুরুর গুরুত্বই যদি সকল সময়ে না দেখিতে পাইলাম, গুরুকে যদি চিরালোকেই আলোকিত বলিয়া

না জানিতে পারিলাম, তবে অজ্ঞানতিমিরান্ধ আমি আমার চক্ষু উন্মীলিত হইবে কি প্রকারে? তুমি পারাবার তুমি সকল সময়েই লোকলোচনের সম্মুখে অপার অপরিমেয় হইয়া থাকিবে এই না? তাহা না হইয়া অন্ধকারে তোমারও দেহাচ্ছাদন দেখিতে হইল। তবে উপায় কি। পথিক দ্রুতবেগে উঠিয় দাঁড়াইয়া পদচারণা করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল কি হবে? আমি যে প্রাণ ছিন্ন করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়াছি আমি যে আমার হৃদয়োদ্যানের প্রস্ফুটিত কুসুমের মাধুর্য্যময় সৌন্দর্য্যে নশ্বরতা ও সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া অবিনশ্বর মহত্বের অনুসন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়াছি তাহাকে পাই কোথা? তুমি আকাশগ্রাসী পারাবার,তোমায় পাইয়া বড় আনন্দে ভাবিয়াছিলাম এই বুঝি পাইয়াছি যাহার জন্য প্রাণ ক্ষত বিক্ষত করিয়াছি এই বুঝি সেই মহত্বকে পাইয়াছি। কিন্তু কই তাহা হইল কই তুমিও তো দেখিতেছি মহান্ নহ, হইলে এমন করিয়া অন্ধকারে অন্তর্হিত হইবে কেন? হায় তবে কি হবে? হতাশের কম্পিতস্বরে পথিক বলিয়া উঠিল হায় তবে কি হবে? সবই কি অন্ধকার, অন্ধকারেই কি সব? তবে সর্ব্বময় কি বলিয়া তোমায় জানিব। জগদীশ। আমায় এমন করিয়া আঁধারে ফেলিলে কেন? পথিক দাঁড়াইয়াছিল আবার বসিয়া পড়িল।

গর্জনের উপর গর্জন করিয়া উন্মুক্ত সমুদ্রতরঙ্গ তীরে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হু হু করিয়া বাতাস সে উন্মুক্ত প্রদেশে বহিয়া যাইতে লাগিল। সেখানে তখন সবই উন্মুক্ত—আকাশ উন্মুক্ত, সমুদ্র উন্মুক্ত, দিক্চক্রবাল উন্মুক্ত, কিন্তু সবই অন্ধকারে অবরুদ্ধ সবই অস্ফুট। পতিতোন্মুক্ত ভবিষ্যতের ন্যায় সবই যেন অপরিজ্ঞেয় সবই যেন ভয়ঙ্কর। পথিক একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল। দেখিল সবই যেন তাহার হৃদয়ের সাক্ষাৎ নৈরাশ্য। পথিক তখন অবসন্ন-

চিত্তে-তীরভূমি ছাড়িয়া ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। সে গমনের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই কোন উদ্দেশ্যও নাই; তবে এখন, এমন কবিযা নিরাশায় ডুবিয়া বসিযা থাকিবাব ও কোন প্রয়োজন নাই, তাই গমন করিতে লাগিল। গতি মন্থর, দৃষ্টি অবসন্ন, অন্তর শূন্যময়।

শূন্যাত্মন্ অম্বব। তুমি এত নক্ষত্রের মালা পবিয়া সাজিয়া রহিযাছ কেন? যাইতে যাইতে শতসহস্রনক্ষত্রশোভিত ঐ আকাশপানে চাহিয়া পথিক ভাবিতে লাগিল আকাশ তুমি এত নক্ষত্রখচিত কেন? তোমার উহাতে কি সুখ? আমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণেব শূন্যময অবস্থা দেখিযা বুঝিতে পাবিয়াছি যে যাহাব অন্তর শূন্য হৃদয় নিবাশায পরিপূর্ণ তাহাব আবাব এত অলঙ্কার কেন? সাজে কি? সাজে না। যাহাব সব শূন্য যাহাব বেহ বলিয়া বেহ নাই তাহাব আবাব এত বেশ ভূষা কেন? কোন্ সুখে? কোন সুখে মজিযা তোমার এ ভূষণস্পৃহা? তুমি দূরদর্শী আকাশ তোমাব এ অনভিজ্ঞতা কেন? মনে মনে বলিতে বলিতে পথিক স্ফুটস্বরে বলিযা উঠিল আকাশ তুমি এত নক্ষত্রখচিত কেন?'

"এ রহস্য বুঝাইবার নহে বুঝিবার" আকাশবাণীর ন্যায় একটী ধ্বনি আসিয়া পথিকের কর্ণে প্রবেশ করিল। পথিক চমকিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল পশ্চাতে অনতিদূরে যেন এক মনুষ্য মূর্ত্তি।।। পথিক স্তম্ভিত হইয়া গেল! ক্রমে নিকটে আসিয়া মনুষ্য বলিল, ভয় নাই, আমি সন্ন্যাসী সমুদ্র হইতে স্নান করিয়া আসিতেছি।

পথিক তাঁহার সমুজ্জ্বল দেহকান্তিতে দেখিল তাহাই বটে। সন্ন্যাসী স্নানোত্থিত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জলসিক্ত আর্দ্র জটাজুট পৃষ্ঠে বিলম্বিত দক্ষিণহস্তে জলপূর্ণ কমণ্ডলু বামহস্তে জলার্দ্র চীবরখণ্ড পরিধানে সামান্য কৌপীন মাত্র গলদেশে শুভ্র যজ্ঞসূত্র মুখমণ্ডল

শ্মশ্রুসমাচ্ছন্ন। মূর্ত্তি বড় সৌম্য, প্রসন্ন ও আনন্দময়। দেখিয়াই পথিকের মস্তক আপনা আপনিই যেন তাঁহার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইল। সন্ন্যাসী ব্যগ্রতার সহিত পথিককে উঠাইয়া অতি মধুরস্বরে বলিলেন "উঠ বৎস। আমার সঙ্গে আইস, এই নিকটেই আমার আশ্রম"।

তখন সন্ন্যাসী অগ্রে অগ্রে অনুচ্চস্বরে স্তব পাঠ করিতে করিতে চলিলেন আর পথিক সন্ন্যাসীর সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সন্ন্যাসিমুখোচ্চারিত জগদীশ্বরস্তুতি শুনিতে শুনিতে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সতাং সদ্ভিঃ সঙ্গঃ কথমপি হি পুণ্যেন ভবতি।

(ভবভূতি।)

"ঐ যে মল্লীলতা সর্ব্বাঙ্গে মল্লিকারাশি গাঁথিয়া রাখিয়াছে, উহাতে উহার কি সুখ?" প্রশান্তনয়নে পথিকের পানে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—বলিতে পার কোন্ আত্মসুখে মজিয়া উহার এ ভূষণস্পৃহা?

পথিক নীরব। সে সন্ন্যাসীর সেই প্রথম কথা শুনিয়া অবধি স্তম্ভিত। তাহার পর সাক্ষাৎ। তখন হইতেই বিস্মিত পথিক তাঁহার মাধুর্য্যে মোহিত। তাহার পর কুটীরপ্রবেশ। তাহার পর অতিথি সৎকার। সে এক অদ্ভুত প্রীতিময়। সংসারের অনবরত অনাদরে বিষণ্ণ কঠোরীভূত তাই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর হৃদয়েও এত আদর দেখিয়া পথিক আজ বিহ্বল। শুধু বিহ্বল বলিলে বুঝি সে আদরে পথিক কি হইয়া পড়িয়াছে তাহা ঠিক বলা হয় না, ঠিক বলিতে হইলে বলিতে হয় পথিক যেন আর সে পথিক নহে। যে এত দিন ধরিয়া ভাবিয়া আসিতেছে যে সন্ন্যাসী কি না সংসারে আসিয়া কোন আশাই পূরিল না হৃদয় নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ হইল সংসার ত্যাগ করিতে হইল সন্ন্যাসী হইতে হইল সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাসী হইতে হইল তাহারই নাম সন্ন্যাসী অর্থাৎ সে যেন বিরক্তির মূর্ত্তি সে যেন শুষ্কময় তাহাতে থাকিবে শুধু অপ্রসন্নতা দেখিতে হইবে যেন মরুভূমি কোথাও

কিছুই থাকিবে না বহুদূর বহুদূর ব্যাপিয়া কেবল ধূ ধূ কবিতে থাকিবে। ইহাবই নাম সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসী হইবার জন্যই সে বাটীর বাহিব হইয়াছে। এই ভাবেই যাহাব হৃদয় গঠিত বলিয়া যে আকাশে নক্ষত্র-মালা দেখিয়া ভাবিয়াছিল এ কি। আকাশে আবার নক্ষত্রমালা কেন? আকাশ শূন্যময সে কোথায় মরুভূমির মত ধূ ধূ কবিবে না তাহা না হইযা সে নক্ষত্রমালায় সমুজ্জ্বল? এ কেন? এখন সেই পথিকই এই তাহাব মর্ত সংসাববিরাগী সন্ন্যাসীব হৃদযে অপ্রসন্নতাব পবিবর্ত্তে অতুলনীয স্নিগ্ধতা দেখিযা আর এক রকম হইযা গেল। ভাবিল একি। যে শূন্যময যাহাতে কিছু বলিয়া কিছু থাকা উচিত নহে যাহাকে দেখিলে প্রাণ উদাস হইয়া উঠিবে যে ঔদাস্যের প্রতিমূর্ত্তি সেই সন্ন্যাসীব হৃদযে এত প্রীতি যে দেখিলে প্রাণ জুড়াইযা যায়। এ কি বকম সন্ন্যাসী। এ তো বড অদ্ভুত। যে উদাসীন সে তো শরীরী ঔদাস্য হইবে, তাহা না হইয়া এ যে দেখিতেছি মূর্ত্তিমতী কমনীযতা, যেন পাথবেব গাছে সাক্ষাৎ ফুটন্ত ফুল। বড অদ্ভুত বটে, কিন্তু বড সুন্দর। এই তো ভাল। এইরূপ সন্ন্যাসীই তো উত্তম। এই বজ্রাদপি কঠোবাণি মৃদূনি কুসুমাদপি করিযা প্রাণের গঠন করাই তো প্রকৃত সন্ন্যাসীব কাজ। এইরূপ সন্ন্যাসই তো সন্ন্যাস। আমি এতদিন ধরিয়া যাহাকে সন্ন্যাস ভাবিয়া যে সন্ন্যাসী হইবার জন্য হৃদয মরুভূমি করিতে যাইতেছিলাম তাহাতো ঠিক হইতেছিল না। আমি সংসাবের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদা একটা ঘূর্ণায়মান দুঃখময় পরিবর্ত্তন দেখিয়া সংসারেব উপর ভারি বিরক্ত হইয়া রহিয়াছিলাম। আমার যে ইহা একটা বড নূতন রকমের কাজ তাহা নহে যে একটু ভাল করিয়া সংসারের রকম খানার চর্চ্চা করে তাহারই তাহা হওয়া উচিত। কেননা মনে করিয়া দেখ এই আমি কত যত্ন করিয়া একটী ফুলের গাছ পুঁতিলাম কত জল সেচন করিলাম ফুল ফুটিবে কত আশা। তাহার পর তাহাতে একটী

কোরক দেখা দিল। আমার বড় আনন্দ। আমি যে আনন্দে কি করিব ভাবিযা পাই না। আমি দিনে কতবার সে কোরক দেখিয়া আসি। আমার কত আশা এই কোরক বড হইবে ইহা ফুটিবে ইহাব সৌগন্ধ্যে দিক আমোদিত হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকম রেকমেব আশা। শেষে দেখি কি না ও মা আমার সব আশায ছাই পডিয়া গেল আমাব সে সাধেব কোরকটী কীটদষ্ট হইয়া অকালে বৃন্তচ্যুত হইযা গেল। কি বিড়ম্বনা। আমি একেবাবে আকাশ হইতে পাতালে পডিয়া গেলাম। এ কি কম খেদ। শুধু এই এমন একটী নহে সংসাবে এমন কত কি সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। তা সংসাবেব এরূপ বকমে উহার উপব বিরক্ত হওয়া অসঙ্গত নহে বলিয়া আমি উহাব উপবে বড বিবক্ত হইয়াছিলাম। এই আমার স্বাভাবিক চিত্তের অবস্থা। একেতো আমি এই প্রকৃতিব তাহার উপর কি না দেখি একটী দেবদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্য আসিযা আমাব ধীরে ধীরে তাহার দিকে টানিতেছিল আমি তাহার স্পর্শে স্পর্শে ক্রমে অবশ হইয়া আসিতেছিলাম এমন সময় হঠাৎ চৈতন্য হইল ভাবিলাম এ কি করিতেছি আমিও যে ধীবে ধীরে আশার গ্রাসের দিকে অগ্রসর হই-তেছি এখনি যে আমাযও ঐ শত শত নিরাশাপীডিতের মত আর্ত্তনাদ কবিতে হইবে। পালাও আর না, আমার সংসারে কাজ নাই বলিয়া দেশত্যাগ করিয়াছি। ভাবিয়াছি সন্ন্যাসী হইব। সংসারে যাহা কিছু সুন্দব যাহাবই বিরহে প্রাণে ব্যথা পাইবাব সম্ভাবনা তাহার দিকে ভুলেও তাকাইব না। প্রাণ কঠোর কবিব বজ্রাধিক কঠোর করিব তাহা হইলেই আমার আর সংসারের ভয় থাকিবে না। আমি সুখী হইব। এই ভাবিয়া তো বাড়ীর বাহির হইয়াছি। কিন্তু এই আজ এত দিন ধরিযা এদিক্ ওদিক্ কতদিক্ তো ঘুরিয়া বেড়াইলাম ফুলটী দেখিনা লতাটী ছুইনা ভাল বাতাসটী বহিলে গায়ে ঢাকা দেই বড় ভয়। আর কিছু দেখি না আর কিছু ভাবি না ভাবিতে চেষ্টা করি শুধু সেই শাস্ত্রে লেখা বিরাট্ পুরুষের

বিরাট্ রূপ। সে যে কি চাই তাহা বুঝি না তবু অমনি একটা ফাঁকা খুব খানিকটা বিস্তৃত ভাবকে ভাবিয়া থাকি। কিন্তু সেটা যে কি বুঝিতে পারি না বলিয়া সুখ আর পাই না। তাহার পর ঘুরিতে ঘুরিতে সমুদ্র দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম এই বুঝি সেই বিরাট্ পুরুষের আদর্শ। কেননা আমার বিরাট্ পুরুষের মত উহাও খুব খানিকটা বিস্তৃত। একটু মনে আশার সঞ্চার হইয়াছিল। একটা সাক্ষাৎ বিস্তৃত পদার্থকে দেখিয়া ঐ রকম একটা বিস্তৃত ভাবকে হৃদয়ে পোষণ করিব বলিয়া মনে মনে স্থির করিতেছিলাম। এমন সময় অন্ধকার আসিয়া তো সব মাটী করিয়া দিয়া গেল। সে বিস্তৃত ভাব কোথায় ডুবিয়া গেল। হৃদয় বিস্তৃত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বড়ই কষ্ট পাইতেছিলাম। কি করিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না চিত্ত বড়ই চঞ্চল হইতেছিল। সংসার ত্যাগেও সুখ নাই দেখিয়া আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ হইতেছিলাম। সংসারে ফিরিয়া যাইতে প্রাণ যেন একটু হেলিতেছিল আর অমনি সময় পাইয়া সেই সৌন্দর্য্যের চটক আসিয়া আমায় ভয় দেখাইতেছিল আমি একেবারে আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছিলাম এমন সময় মাথার উপর দেখিলাম কি না একেবারে ফুটন্ত ফুলের বাজার। বড় দুঃখ হইল। আমি যাহার ভয়ে কাতর সেই সৌন্দর্য্য কি না আমার সঙ্গে সঙ্গে। তাই বড় আক্ষেপে আকাশকে তিরস্কার করিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতেই আমার এই শুভযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি এই এমন সাধুর দর্শন পাইলাম। ইঁহার দর্শনে আমার মোহ ঘুচিয়া গেল। আমি বুঝিতে পারিলাম আমি বিপথে যাইতেছিলাম। আমি যে পথে যাইয়া সন্ন্যাসী হইতে যাইতেছিলাম সে পথ পথই নহে। প্রকৃত সন্ন্যাসী হইতে হইলে কেবল যে বজ্রাদপি কঠোরই হইতে হয় তাহা নহে কুসুমাদপি মৃদুও হইতে হয় তবে না লোকোত্তর হওয়া যায়। যে এই সাধারণ সুখ দুঃখে বিকৃত জীবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সুখে দুঃখে অবিকৃত সেই তো প্রকৃত সন্ন্যাসী। সেই পথই

তো প্রকৃত সন্ন্যাসীর পথ। হায় হায় আমি এত দিন কি করিতেছিলাম ভাগ্যে আজ এই মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইল তবে না ইহার প্রাণ পোরা মধুবিমা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম সন্ন্যাসী হইতে হইলে শুধু ধূ ধূ করা আকাশই হইতে হয় না নক্ষত্রমালায় শোভিতও হইতে হয তবে না বজ্রাদপি কঠোর ও কুসুমাদপি মৃদুর একত্র সমাবেশে মহান্ ও সুন্দর হওয়া যায়। বড মধুর। বড উদার। এ ভাবের উপর অন্ধকারের অধিকার নাই। এই ভাব আয়ত্ত করিয়া সংসারে বিচরণ করিতে পারিলে সংসারের সৌন্দর্য্য বা বিভীষিকা কাহারও ভ্রূভঙ্গীতে কাতর হইতে হয না। এই ভাবের উপাসনাই সেই শাস্ত্রে লেখা বিরাট্ পুরুষের উপাসনা। ইহা শিক্ষা করিতে আমি এই সন্ন্যাসীর উপাসনা করিব। পথিক বসিয়াছিল উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাদ-চারণা করিতে লাগিল।

মৃগচর্ম্মে বসিযা সন্ন্যাসীও স্মিতমুখে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "কেমন বৎস। আকাশে নক্ষত্রমালা কেন তাহা বুঝিতে পারিলে কি?

"পারিলাম। আমি আপনারই সেবা করিব" বলিয়া পথিক সন্ন্যা-সীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী বুঝিলেন। বলিলেন আমার নহে ইহার সেবা করিও। পরে বলিলেন এই মৃগাজিন ইহাতে শয়ন করিও। বলিয়া সন্ন্যাসী নিদ্রিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

সুধীর কোথায়? চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিতে করিতে বলদেব আচার্য্য ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন আজ এখানেও সুধীরকে দেখিতে পাইতেছিনা কেন? সুধীর গেল কোথায়?

আচার্য্যের আগমনে ছাত্রগণ সব উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল কই না আজ এখনও উনি এখানে আসেন না আমরাও আর ভাবিতেছি আজ এমন হইতেছে কেন? তা তিনি কি বাড়ীতে নাই?

না কই দেখিলাম না তো? বলিয়া অধ্যাপক আসন গ্রহণ করিলেন।

ছাত্রগণ তখন একে একে গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিয়া আপন আপন স্থানে আসিয়া বসিল এবং ক্রমে ক্রমে যাহার যাহা পাঠ সে তাঁহার নিকটে গিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। এইরূপে বেলা ক্রমে দেড় প্রহর অতীত হইল। আচার্য্যের পাঠনা সমাপ্ত হইল তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। ছাত্রমণ্ডলী উঠিয়া দাঁড়াইল ও একে একে পূর্ব্ববৎ প্রণাম করিতে লাগিল।

সুধীরকে তখনও সেখানে আসিতে না দেখিয়া আচার্য্য উদ্বিগ্ন

হইলেন এবং ছাত্রগণকে বলিলেন দেখ সুধীব এখনও যখন আসিলনা তখন একবাব সন্ধানের আবশ্যক হইযাছে। সে পাঠের সময কখনও অনুপস্থিত থাকে না অন্য কোন কাজও কবেনা, তা তোমবা একবাব তাহাব সন্ধান লও দেখি। এই কথা বলিয়া বলদেব আচার্য্য চিন্তিত অন্তবে গৃহের দিকে যাইলেন। সুধীবের অদর্শনে ছাত্রেবাও সব উদ্বিগ। সুধীবেব ব্যবহারে সুধীরকে তাহাবা সকলেই বড মান্য কবে বডই আপনাব বলিযা জ্ঞান কবে, তাই আচার্য্যের আজ্ঞামাত্রে তাহারা সকলে ইতস্ততঃ তাহাব সন্ধানে বহির্গত হইল।

আচার্য্য গৃহে গিযা দেখিলেন সুধীব আসে নাই। প্রাণ কিছু ব্যাকুল হইযা উঠিল। হইবারই কথা, তিনি সুধীরকে বড় ভালবাসেন। সুধীব আচার্য্যেব শুধু ছাত্র নহে তাঁহার বন্ধুর পুত্র এবং নিজের পালিত পুত্র। সুধীর বাল্যকালেই মাতৃহারা। সুধীরের পিতা সুদেব হঠাৎ অর্দ্ধাঙ্গবিহনে ক্ষীণশক্তি হওযায় একাকী এ বিশাল সংসারকে আযত্ত করিবার সামর্থ্য নাই বুঝিযা তখনি সংসারত্যাগী হইবার বাসনা করেন। তবে প্রিযতম মিত্র বলদেব তাঁহাকে যথেষ্ট বুঝান বলিযা কযেক দিন মাত্র গৃহে থাকেন। পরে শিশুপুত্র সুধীরকে বলদেবের হস্তে সমর্পণ করিযা সুদেব সংসাব ত্যাগ করেন। তদবধিই সেই পিতৃমাতৃহীন সুধীর বলদেবের হয। বলদেবও নিঃসন্তান শিশুটী পাইযা বলদেবেব পত্নী তাহাকে পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিতে থাকেন।

সংসাবের সুকোমল স্নেহ বুঝি সুধীরেব অদৃষ্টে অলিখিত, তাই সুধীরের যখন পাঁচ বৎসর বয়স তখন বলদেব আচার্য্যের পত্নীও ইহ-লোক ত্যাগ কবেন। বলদেব সেই সময একবাব মিত্রবর সুদেবের পরিগৃহীত পথের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণের বন্ধন বন্ধুর হৃদযপ্রতিবিম্ব সুধীরের মুখপানে চাহিয়া পশ্চাৎপদ

হন। তিনি সুধীরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার বজ্রাহতবক্ষ শীতল করেন। বলদেব সুধীরকে লইয়াই সংসারী হন।

সুধীর বাল্যকাল হইতেই সুধীর। তাহার উপর বলদেব তাহাকে অতি যত্নের সহিত লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন। বলদেব সুপণ্ডিত। তাঁহার শিক্ষার গুণে অল্প বয়সেই সুধীর শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া উঠিতে লাগিল।

সুধীর প্রিয়দর্শন তাহার প্রতি অঙ্গের অন্তরে বাহিরে কি যে এক মাধুর্য্য মাখান আছে যে তাহাতে তাহার গ্রামের সকলেই মুগ্ধ। আর বলদেব আচার্য্য তাঁহার তো কথাই নাই। তিনি সুধীরকে তাহার সেই শৈশবের সুদেব বলিয়াই মনে করেন। সুধীরের মধুর মূর্ত্তি দেখিলেই তাঁহার সেই মধুবোদার বাল্যপ্রেম উথলিয়া উঠে। এখন তিনি প্রাচীন, তাই তিনি সে বাল্যপ্রেমের মন্দারমকরন্দতুল্য মাধুর্য্য হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া বাহিরে শুধু তাহার যে সৌগন্ধ্যটুকু ছড়াইয়া থাকেন, তাহাতেই সুধীর আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করে। সুধীরে আচার্য্যে এই সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ পিতা পুত্রে যে সম্বন্ধ তাহা হইতে কোন অংশেই ন্যূন নহে সুতরাং সুধীরের এই অচিন্ত্যনীয় অনুপস্থিতিতে আচার্য্যের কাতর হওয়া অসম্ভব নহে।

আচার্য্য বাড়ীতে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন তখনও ছাত্রেরা কেহ আসিয়া সুধীরের কোন সংবাদ দিয়া গেলনা, মন বড়ই ব্যস্ত হইল বাড়ীতে স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। হয়ত সুধীর এতক্ষণ চতুষ্পাঠীতে আসিয়াছে ভাবিয়া তিনি পুনরায় চতুষ্পাঠী অভিমুখে গমন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই সে হৃদয়দেবী প্রাণের পিয়াস
ধরতে অপরূপ সৃষ্টি স্বর্গের মন্দার।
হারালে কি হবে ভেবে হইয়া হতাশ
না চাহি ইহার পানে দরি গো সংসার॥ (লেখক।)

প্রাতঃকাল। ঊষা সকালে উঠিয়া একটী নির্জ্জনগৃহে বসিয়া একখানি রামায়ণ পড়িতেছে। রামায়ণ তাহার পড়া জিনিষ। সে অনেক দিন হইতেই সুধীরের নিকট রামায়ণ পড়িয়া আসিতেছে। মেয়েটী জগদীশ্বর রায়ের এক মাত্র সন্তান। জগদীশ্বর রায় এক জন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। রামচন্দ্রপুরে তাঁহার নিবাস। বাঢে এ গ্রাম খানি পাঁচ জন ভদ্রলোকের গ্রাম। যে পাঁচটী জিনিষ একত্রে থাকিলে গ্রাম প্রকৃত বাসের উপযুক্ত হয় এ গ্রাম খানিতে তাহা সমস্তই আছে। দু'জন পাঁচজন মধ্যবিত্ত ধনী আছেন বলদেব আচার্য্যের মত শ্রেষ্ঠ শ্রোত্রিয় এই গ্রামেই বাস করেন, আর রাজা—তা জমীদার জগৎ রায়ই রাজার ন্যায় এ গ্রামটীকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন, নির্ম্মল সরস্বতী জলে গ্রামখানির দেহ পার্শ্ব বিধৌত, দুজন পাঁচজন বিজ্ঞ বিজ্ঞ কবিরাজও এ গ্রামে বাস করিয়া থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে গ্রাম খানিতে সকল বিষয়েই সুখ শান্তি আছে। থাকিবারই কথা

যেখানে ভগবানের একাধারে এত কৃপা সেখানে সকল বিষয়েই চিরশান্তি বিরাজ করিয়া থাকে। ভগবানের কৃপায় গ্রামের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দুঃখে দুঃখী, প্রত্যেকের সুখে সুখী। এক খানি গ্রাম যেন একটী শান্তিময় বিপুল সংসার।"

উষা জগদীশ্বর রায়ের বড় আদরের মেয়ে, মেয়েটিই তাঁহার ও তাঁহার পত্নী মনোরমার একমাত্র সংসারবন্ধন স্নেহগ্রন্থি। মেয়েটীকে লইয়াই তাঁহাদের সংসার। তাই তাঁহাদের একান্ত ইচ্ছা যে মেয়েটীকে একটী বিশেষ সৎপাত্রে দান করেন সেইজন্য মেয়েটীর বিবাহের বয়স হইলেও পাত্র মনোমত হইয়া উঠে নাই বলিয়া মেয়েটীর আজও বিবাহ হয় নাই। তবে আজ*কাল কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় সুধীরের হস্তেই নাকি মেয়েটীকে সমর্পণ করিতে দম্পতির একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। আমরা কিন্তু কখনও এ কথা কি জগদীশ্বর কি মনোরমা কাহারও মুখে শুনি নাই। তবে সুধীরকে তাঁহারা অত্যন্ত স্নেহ করেন এই মাত্র। তা সুধীরের গুণে গ্রামের সকলেই তো সুধীরকে তেমন ভাল বাসিয়া থাকেন, তা তাঁহারা তাহাকে ভাল না বাসিবেন কেন। বিশেষ উষাকে পড়াইবার দরুণ তাঁহাদের সহিত সুধীরের ঘনিষ্ঠতাটা কিছু বেশী হইয়া পড়িয়াছে।

উষা অনেক দিন হইতেই সুধীরের নিকট পড়িতেছে। বাল্যকাল হইতেই তাহার লেখা পড়া শিখিবার বড় সাধ। সন্ধ্যা উষার প্রথম লেখা পড়ার শিক্ষয়িত্রী। সন্ধ্যা জগদীশ্বর রায়ের প্রতিবেশিনী-কন্যা। বিবাহের পর সন্ধ্যা শ্বশুর বাড়িতেই থাকিত। আজ তিন চারি বৎসর হইল বিধাতার কঠোর আক্রমণে সন্ধ্যার শ্বশুড় শাশুড়ী ও পিতা মাতা যুগপৎ ইহলোক ত্যাগ করিলে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যার স্বামী হৃষীকেশ একেবারে এককালে সমস্ত আত্মীয়নাশে নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া পড়েন। সন্ধ্যাই সন্ধ্যার পিতা মাতার এক মাত্র সন্তান, তাহার উপর

সন্ধ্যার কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে এই কারণে, আর যে গ্রামে সন্ধ্যার শ্বশুর বাড়ী সেখানেও তত ভদ্রলোকের বসবাস নাই এ কারণেও সন্ধ্যার স্বামী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রামচন্দ্রপুরেই আসিয়া বাস করা স্থির করেন। রামচন্দ্রপুরের ভদ্রমণ্ডলীও তাঁহাকে সাদরে বাস করান। তদবধি সন্ধ্যার বাপের বাড়ীতেই থাকা হয়। সন্ধ্যার সন্তানাদি হয় নাই সুতরাং মনুষ্য-অন্তরের যে স্বাভাবিকী সমাশ্রয়ণাত্মিকা স্নেহপ্রবৃত্তি তাহা তাহার ও তাহার স্বামীর উভয়েরই অন্তরে গাঢ় নিহিত। তাহাদের প্রেম সন্তানস্বরূপে মুকুলিত হয় নাই বলিয়া তাহা উভয়েরই সর্ব্বাবয়বে শোণিতীভূত। দম্পতিটী বড় সুখী। তাহাদিগকে দেখিয়াও সকলে সুখী হয়। বিশেষ সন্ধ্যা গ্রামের মেয়ে, তাহার উপর তাহার সরল চতুর ও রসাল স্বভাবে সবাই তাহাকে ভালবাসে।

জগদীশ্বর রায়ের বাড়ী সন্ধ্যার বাপের বাড়ীর নিকটেই এবং জগদীশ্বর সম্পর্কে সন্ধ্যার খুল্লতাত, তাই সন্ধ্যা তাঁহার বাড়ী সর্ব্বদাই যাতায়াত করিয়া থাকে।

জগদীশ্বরের কন্যা উষাকে সন্ধ্যা বড়ই ভালবাসে, উষাও সন্ধ্যাকে বড় আপনার বলিয়া মনে করে। উষার লেখা পড়া করিবার বড় সাধ দেখিয়া উষার মা উষাকে সন্ধ্যার হস্তে সমর্পণ করিয়া দেন। সন্ধ্যারও তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে কিছু কিছু লেখা পড়া শেখা আছে বলিয়া তিনি উষার গুরুমহাশয়গিরি করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু কিয়দ্দিন পরে আর তাঁহার বিদ্যায় কুলায় না দেখিয়া তিনি উষার মাকে বলিয়া সুধীরের হস্তে উষার পড়াইবার ভার ন্যস্ত করান। তদবধিই উষা সুধীরের নিকটেই পড়িয়া আসিতেছে।

ক্রমে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উষার বয়সও যেমন বাড়িতে লাগিল তেমনি তাহার মনেও কত রকম কি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। উষা পড়া ভালবাসে বলিয়া সুধীরের নিকট পড়ে, কিন্তু তাহার যেন মনে হয়

সে এখন পড়া অপেক্ষা ভালবাসে সুধীরের দর্শন। আচ্ছা তাহাই হউক, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু শুধু তাহাতেই কি সব মিটে যায়? কই মিটেনা তো? উষা ক্রমে দেখিতে লাগিল সংসার তো বড় কু-স্থান, এখানে যে অনেক যন্ত্রণা। এখন করি কি? এইরূপে উষা আজকাল বড় মানসিক গোলমালে পড়িয়াছে।

মেয়েটী সবে এই তের উত্তরাইয়া চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। বালিকা যেন বুঝিতে পারিয়াছে যে সে এই সবেমাত্র এই সংসার-সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বুঝিতে পারিয়াছে যে সংসারের এই সর্ব্বসাধারণের মত তাহাকেও ইহাতে ঝাঁপ দিতে হইবে। কিন্তু সে ভাবে—ঝাঁপতো দেখিতেছি সকলের মতন দিতেই হবে, কিন্তু ইহাতে বিপদও তো অনেক। সে সব বিপদে ধৈর্য্য রাখিয়া সবলে ইহাতে সাঁতার দিতে হইবে, সে তো ব্যাপার বড় শক্ত। কেহ তেমন করিতেছে বা করিয়াছে এমন কাহাকে সম্মুখে না রাখিয়া তো তাহা করা যায়না। তা তাহাকে পাই কোথা? বর্ত্তমানের মুখপানে চাহিলে তো সে সমুজ্জ্বল আদর্শমণির প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, তবে অতীতে যাই—তাই উষা আজ কিছু দিন ধরিয়া অতীতের সেই অতুলনীযোজ্জ্বল সীতারাম-চরিত্রের আদর্শ রামায়ণ পড়িয়া আসিতেছে। রামায়ণে উষার বড় প্রীতি। রামসীতার কাহিনী উষা অনেকবার শুনিয়াছে, তবু আবার যখনি শুনে উষার তাহাতে সেই সমান আনন্দই হয়। তা হইবারই কথা। ভারতবর্ষের হিন্দুমাত্রই রামসীতার চরিত্রে এমনিই বিমোহিত যে রামসীতার নামশ্রবণেই তাহাদের হৃদয়ে এক আনন্দময় আলোক ফুটিয়া উঠে। রামসীতা ভারতের এমনিই এক সুখস্মৃতি। রামায়ণ সেই রামসীতার একমাত্র ইতিহাস। কি করিয়া তাঁহারা এই সংসার-পারাবারে ঝাঁপ দিয়া রাশি রাশি বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া সবলে সাঁতার দিতে দিতে উহার অপর পারে গিয়াছিলেন রামায়ণ তাহার সাক্ষী।

কি করিলে মনুষ্য মনুষ্যসমাজে দেবতা হয় রামায়ণ তাহার নিদর্শন। উষার—সংসারসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া বাত্যান্দোলিত তরঙ্গমালা দেখিয়া ভীত বিমুগ্ধ বালিকা উষাব—একবার চিরশ্রুত সেই সীতারামের সেই উজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি দেখিবার বড সাধ হইযাছে,তাই উষা আজ বড় আগ্রহে তাহার আদরের রামাযণখানি পডিতেছে। পড়িতেছে রামায়ণের উত্তরকাণ্ড। প্রস্তাব সীতাব বনবাস। কি লোমহর্ষণকর দৃশ্য !!! গর্ভদোহদের সম্পাদনচ্ছলে রামচন্দ্র সীতাকে বাজপুরী হইতে বহির্ভূত করিলেন। সীতা সুবিশ্বস্তা, তিনি পরমোৎসুক্যে রথারোহণ করিলেন। তাঁহার বড় আনন্দ, তিনি তাঁহার সেই প্রীতিময়ী ঋষিকন্যাদিগকে পুনরবলোকন করিবেন। কিন্তু হায়! তিনি জানিতে পারিলেন না যে তিনি চিরদিনের জন্য প্রিয়তমের অঙ্কবিচ্যুত হইতে রথারোহণ করিলেন। লক্ষ্মণ অনুচর তিনি রাজাজ্ঞায় যন্ত্রিতমনাঃ। রথ ক্রমে গঙ্গাতীরে আসিল। গঙ্গা পার হইলেই বাল্মীকির আশ্রম। এইবার সীতার বিসর্জ্জন। লক্ষ্মণ কাঁদিযা ফেলিলেন। তাহার পর হইতেই সীতাচরিত্রের চিত্রণ। উষা পডিতেছে আর কাঁদিতেছে আর রামচন্দ্রের দেবত্বে সন্দিহান হইতেছে। বালিকা বুঝিতে পারিতেছে না রামচন্দ্র কেমন দেবতা। বুঝিতে না পারায় মনে বড আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। ভাবিল—যদি পারি সুধীর দাদাকে জিজ্ঞাসা করিব। ভাবিয়া পুঁথি ঝাপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় হঠাৎ সন্ধ্যা আসিয়া উষাকে বলিল—উষা বড় চুপ করে একলাটী মলিনমুখে বসে রয়েছিস্ যে রে? তোর অরুণোদয় হবে কবে? তোকে হাঁসতে দেখলে যে বাঁচি।

উষা একটু হাসিল, বলিল,—দিদি সকল উষারই কি সমান ভাগ্যি, কত উষা আবার জন্ম বড় ঘোর অন্ধকায় লইয়াই দেখা দেয়।

দিদি বলিল,—বালাই জন্ম বড় হ'তে যাবে কেন? তবে অরুণোদয়

হ তৈ একটু দেরী হচ্ছে, তা'তাতে আর ভাবনা কি ? এখন চল্ দেখি একবার বলদেব আচার্য্যের বাড়ী যাই। শুনছি সুধীর নাকি আজ কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় গিয়াছে, এতক্ষণ এসেছে কি না একবার খবরটা নিয়ে আসি।

কথাটা শুনিয়া ঊষা অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সন্ধ্যা আর কোন কথা না কহিয়া ঊষার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল।

তখন দু'জনে আস্তে আস্তে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সে জানিবে কিসে যে যাতনা বিষে।
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।

দেখিতে দেখিতে আজ পাঁচ পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, তবু সুধীরের কোন সংবাদ নাই। তখন গ্রামের সকলেই প্রায় জানিতে পারিল। সুধীরকে সকলেই বড় ভালবাসে, সুতরাং তাহার অনুসন্ধানের জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। স্বয়ং জমীদার জগৎ রায় বলদেব আচার্যকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং সুধীরের অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন। অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

সুধীরের নিরুদ্দেশে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই দুঃখিত। পূর্ণচন্দ্রের বিহনে সংসার একটী উজ্জলতম রত্নে বঞ্চিত, সুতরাং দুঃখিত তো বটেই। কিন্তু যিনি রাত্রি তিনি একেবারেই চিরমলিন চিরান্ধকারে নিমজ্জিত। যদি কেহ তাহা বুঝিবার চেষ্টা করে,বুঝিতে পারে—রজনীর দুর্দশা কত। সুধীরের নিরুদ্দেশেও তাহাই। তাহার বিহনে সকলে দুঃখিত কিন্তু হয় তো কেহ চিরান্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু হায় কে তাহা অত যত্ন করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিবে?

বলদেব আচার্য্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। বেদান্তের মৃতসঞ্জীবক জ্ঞানমন্ত্রে তিনি সিদ্ধপ্রায়। তাঁহার সেই "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্ন, সুখেষু বিগতস্পৃহ" ব্রহ্ম-

জ্ঞানবিশাল অন্তরে সুধীরের অদর্শন ক্রমে আর শোককর রহিল না। রহিতে পারে না বলিয়াই রহিল না। কিন্তু যে সীতার বিসর্জ্জনে শ্রীরাম চন্দ্রের দেবত্বে সন্দিহান, তাহার সেই অতটুকু হৃদয়ে ইহা যে একেবারে বজ্রাঘাত। উষা ভাবিতে পারে না দিনান্তেও সুধীরের অদর্শন কেমন? কিন্তু আজ এই এক দিন এক দিন করিয়া পাঁচ পাঁচ দিন তো কাটিয়া গিয়াছে, প্রতি মুহূর্ত্তে উষা ভাবিতেছে কেমন করিয়া আমার অতীত মুহূর্ত্তটী কাটিয়া গেল?

উষা বালিকা অপরিণতবয়স্কা, কিন্তু একেবারে তো শিশু নহে তাহার চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। মাধবীলতার সর্ব্বাঙ্গে বসন্তানিল লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে, লতা তাহার মৃদুলস্পর্শে ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছে। আসব জমকাইয়া কোকিল সুর মিলাইয়া গলা সাধিতেছে গান এখনও ধরে নাই। ঐ কৃষ্ণ প্রতিপদের চন্দ্র দূরাকাশে শুধু আভাসে দেখা দিতেছে, পৃথিবী যেন উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে। আকাশ মেঘে মেঘময়, সূচিবিদ্ধ অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন, পৃথিবী পুটমধ্যে সংবদ্ধ, সংসার স্তম্ভিত,বাতাস উঠে উঠে উঠে না। ভাগীরথী গোমুখীর মুখে মুখে, প্রবাহ ছোটে ছোটে ছোটে না। সমুদ্রের জল তরঙ্গে তরঙ্গে আভাসে আলোকময়, সূর্য্য উঠে উঠে উঠে না। উষাও ঠিক্ যেন তাই। বয়োধর্ম্মে আজ কিছু দিন ধরিয়া উষাও যেন তেমনি সুধীরে ডোবে ডোবে ডোবে না। উষা পড়িত—সুধীরদাদার কাছে রামায়ণ পড়িত। বেশ পড়িত—শঙ্কা নাই,সম্ভ্রম নাই,বেশ করিয়া সব বুঝিয়া লইত। তাহার পর যতই দিন যাইতে লাগিল ক্রমে যেন কি হইয়া যাইতে লাগিল। আর বুঝিয়া লইতে পারে না, কেবল শুনিয়া যায়। বুঝিয়া লইতে গেলে বেশী কথা কহিতে হয়, উষা ক্রমে আর তাহা পারিত না। কেন যে পারিত না তাহা কিন্তু সে বুঝিতে পারিত না। আপনার অবস্থার মত প্রথম প্রথম সে মিথিলায় প্রথমরামদর্শনে সীতার সে

অবস্থার অর্থও বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, কিন্তু বুঝাইবার জন্য সুধীর দাদাকে জিজ্ঞাসাও করিতে পারিত না। তাহার পর ও কি কণ্ঠস্বর! ও কি দর্শন! উষা পড়িবার সময় পুঁথি খুলিয়া কেবল তাহাই ভাবিত, আর সেই মিথিলার সীতাকে মনে মনে গালাগালি দিয়া বলিত পোড়ার মুখি! আগে রাম কি তাহা দেখ্, তবে অমন কর্। তাহার পর দিনের পর যতই দিন যাইতে লাগিল, উষা রামায়ণ পড়ে আর ভাখে সীতা কি সুখিনী! তখন আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ভাবে আ মরি এমন দিন আমার হবে?

উষা যে কিরূপ মনের অবস্থায় দিন কাটায় তাহা আর কেহ বড় জানে না, একটু আধটু জানে শুধু সন্ধ্যা। শুধু যে জানিয়াই সে চুপ করিয়া থাকে তাহা নহে, উষার মনের সে ভাবটুকুকে ধরিবার জন্য সে চৌকিদারীও করে। সন্ধ্যা একে পরিণতবয়স্কা, তাতে সুচতুরা, তাহার উপর আবার সন্তানাদি হয় নাই, সুতরাং পাহারাগিরীতে তাহার সময় ঢের। আর এ সব কাজে সে বড় মজবুত, হৃষীকেশ তাহার প্রধান সাক্ষী। উষাও জানিয়াছিল যে সে সন্ধ্যাদিদির কাছে ধরা পড়িয়াছে। পড়িবার সময় যদি সন্ধ্যা উষার কাছে কোন দিন আসিত তবে উষা একেবারে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়িত।

উষা আজ ভাবনার স্রোতে পড়িয়াছে। কত কি যে ভাবিতেছে তাহার আর সীমা নাই। তাহার মধ্যে কতদিন অগ্রে উদ্ভূত সেই অঙ্কুর হইতে আজিকার এই আপনার পরিপূর্ণদেহ অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে একটী দিনের একটী কথা মনে পড়িয়া গেল। এক দিন সুধীর পড়াইতেছে—

প্রকৃত্যৈব প্রিয়া সীতা রামস্যাসীম্মহাত্মনঃ।
প্রিয়ভাবঃ স তু তয়া স্বগুণৈরেব বর্দ্ধিতঃ॥

ব্যাখ্যা হইতেছে, উষা মস্তক অবনত করিয়া শুনিতেছে, এমন সময়

সন্ধ্যা আসিয়া তথায় দেখা দিল। উষা একেবারে ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। সন্ধ্যা বোধ হয় যেন তাহা বুঝিতে পারিয়াই একটু হাসিতে হাসিতে সুধীবকে জিজ্ঞাসা কবিল সুধীর বামসীতা না সীতাবাম? উষা দিদিব দিকে ভ্রূকুটী করিল, সন্ধ্যা আরও হাসিল, বলিল বল দেখি সুধীব বামসীতা না সীতাবাম? আগে কাকে ধরিব। সুধীব পাশ কাটাইল, হাসিতে হাসিতে বলিল দিদি ওসব গোলমালে কাজ কি? বামলক্ষ্মণই তো বেশ। সন্ধ্যা "আচ্ছা দেখা যাবে" বলিযা হাসিতে হাসিতে সেখান হইতে চলিযা গেল। উষাব হাতে বাতাস লাগিল।

অতীতেব সেই শুভমূহূর্ত্তেব সেই শুভ ছবিখানি আজ উষাব সমক্ষে আসিয়া শুভরূপ দেখাইতে লাগিল। উষা দেখিতে লাগিল —সেই সুধীব, সেই উষা, সেই দিদি। কি মধুর সম্মিলন!!! কিন্তু আজ এ কি! আমি কোথায়? সুধীব কোথায়? সুধীব যে সেদিন দিদিব কাছে ধবা পড়িবে না বলিযা "বামলক্ষ্মণ" বলিয়াছিল সে কি শুধু ধবা পড়িবাব ভযে নহে? সুধীব কি সত্য সত্যই বামে সীতায় কোন সম্পর্ক দেখাইতে চাহে না বলিয়াই "বামলক্ষ্মণ বলিযাছিল তাই নিজে তফাৎ হইযা আমায় তাহা দেখাইল? তবে কি সুধীব আর আসিবে না বলিযাই চলিযা গিযাছে? না না, তা নয, বামলক্ষ্মণ হইলে কি সীতাব মন হইতে নাই? তাই তো ছিল, সুধীব আসিবে বৈকি। কিন্তু উষর এ আকাশে গড়া দেবমন্দির যেমন গড়া অমনি ভাঙ্গিয়া যাওযা। উষা চারিদিকে অন্ধকাব দেখিতে লাগিল। ভাবিল—তাইতো ছিল বটে; কিন্তু তাহা যাহাব ছিল তাহার ছিল আমাব অদৃষ্টে তাহা হইবে কেন? বালিকা কিছুই স্থিব করিতে না পারিযা হাপুস নযনে কাঁদিতে লাগিল।

তুমি সংসাব তোমাব অভাব কি? তোমাব বিপুল ঐশ্বর্য্য তোমাব দুঃখ কিসের? তুমি তো কিছুরই জন্য লালায়িত নহ? তোমার

আকাশ আছে, ইচ্ছা করিলে অনন্ত কাল ধরিয়া তুমি তাহার নীলপথে ঘুরিয়া বেড়াইতে পার। তোমার আকাশে সূর্য্য আছে, চন্দ্র আছে, নক্ষত্রমালা আছে, তুমি সূর্য্যের সহস্ররশ্মি লইয়া, চন্দ্রের শীতল আলোক মাখিয়া, শিরোদেশে নক্ষত্রের মালা পরিয়া আনন্দে আপনার সর্ব্বভূষণে বিভূষিত, সর্ব্বরসের আধার সর্ব্বশরীর নিরীক্ষণ করিতে পার। তোমার কত না সমুদ্র তাহাতে কত না রত্ন, তোমার অভাব কিসের? তুমি কেন তোমার এই বিপুল শরীরের কোথাকার কোন পার্শ্বের ঐ ধূলিকণাটী লইয়া ক্রীড়া করিতেছ? তোমার কাছে এ ক্ষুদ্রপ্রাণ বালিকাটা কি? কেন উহাকে কাঁদাইতেছ? উহার ঐ অশ্রুবিন্দুগুলিতে সমুদ্রের অধীশ্বর তুমি তোমার কি প্রয়োজন? উহার হৃদয় শূন্য করিয়া তোমার বাড়িবে কি? তোমার আকাশ যে অনন্ত। যে সর্ব্বভূষণে বিভূষিত। উহার ঐ হাসিটুকুতে তোমার আর কত সৌন্দর্য্য বাড়িয়া উঠিবে? তুমি কেন উহার হাসিটুকু কাড়িয়া লইতেছ? কিন্তু হায়! বলি কাকে, শুনেই বা কে? তুমি যতই কাঁদ, যতই হাহাকার করিয়া গগন ফাটাইয়া দেও, সংসারের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। এখনও হয়ও নাই, হইবেও না। আজন্ম পিতা মাতার সযত্নপ্রতিপালিতা চরিতার্থসর্ব্বকামনা উষা জানিত না সংসার কেমন? সংসারে আশার তাড়না কেমন? নৈরাশের যন্ত্রণা কি ভয়ঙ্কর? উষা—আজ ব্যথিতহৃদয়া উষা বুঝিতে পারিতেছেনা তাহার এখন অবস্থা কি? বালিকা যন্ত্রণায় অধীর হইয়া তাড়াতাড়ি মার কাছে দৌড়াইয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কলনাৎ সর্ব্ব ভূতানাং কাল ইত্যভিধীয়তে।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর শতাব্দের পর শতাব্দ কালের তো ইহাই নিয়ম। তুমি বাল্মীকি সহস্র বৎসরের তপস্যায় যে নির্ম্মলতা অর্জন করিয়া রামায়ণের কবি হইলে, কাল সেই তোমাকে অনায়াসে পশ্চাতে রাখিয়া চলিতে থাকিল। তুমি পরশুরাম ক্ষত্রিয়রুধিরজলে জগৎ প্লাবিত করিলে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইল, একবার নহে, একুশবার পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য হইল তোমার ভয়ে দেশ স্তম্ভিত। দেশের লোকে তোমাকে দেবতা বলিয়া স্তব করিতে লাগিল। কিন্তু কই, কাল তো তোমায় ভয় করিল না? সে তোমাকেও তো স্মৃতির গর্ভে সজোরে নিঃক্ষেপ করিল। তুমি চিরদিনের জন্য তথায় প্রোথিত হইয়া রহিলে।

কালে যে এমন কত কি হইল কত কি যাইল কে তাহার গণনা করিয়া রাখিয়াছে? রাজা হও, প্রজা হও, ধনী হও, দরিদ্র হও, পণ্ডিত হও, মূর্খ হও, যাহাই কেন হও না পরিণামে সকলকেই সেই অতীতের দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে। কালের সর্ব্বগ্রাসী উদরে তাহার সন্ধান করিতে হইবে, কাল এমনিই এক অদ্ভুত পদার্থ।

বড় বেশী দিনের কথা নহে যেদিনের কথা লইয়া আমাদের এই আখ্যায়িকা সে দিনের সেই বাঙ্গালার অধীশ্বর সেই স্থলেমান কিরাণী, সেই তাহার প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতি কালাপাহাড, আজ তাহারা সব কোথায়? দিন গণনা করিয়া দেখ, দেখিবে কাল তাহাদের কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে। আজ প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর কাটিয়া যাইতে বসিল তাহাদের লীলাখেলা সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে। কালের এইরূপই আচরণ।

কালের এই আচরণের ভিতরে কিন্তু একটু চমৎকারিত্ব আছে। চমৎকারিত্ব এই যে কাল যাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে—যাহা যাহা অতীত হইয়া গিয়াছে, অতীতের সেই সবই যদি কখনও বর্ণিত হয় মনে হয় যেন সবই কেমন মনোহর। অতীতের বলিয়া একটা নগণ্য পিপীলিকার কথা পাড শরীর যেন আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে। এই চমৎকারিত্ব আছে বলিয়াই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকার অতীতের দোহাই দিয়া এই ক্ষুদ্র গল্পটুকু লিখিতে সাহস করিয়াছে, নহিলে ইহাতে আছে কি? শুধু রূপকথা বইতো নয়? তবে শপথ করিয়াই বা কে বলিতে পারে যে অতীতে ইহা ঘটে নাই?

অতএব জানা যাইতেছে যে আমাদের এই আখ্যায়িকা আজ প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের পূর্ব্বের। যখনকার এ ঘটনা তখন বঙ্গে স্থলেমান কিরাণীই নরপতি। হিন্দুস্থানে তখন আকবরের ন্যায় বাদশাহ থাকিলেও বঙ্গে স্থলেমানই সর্ব্বেসর্ব্বা। স্থলেমান তাঁহার সেনাপতি কালাপাহাড়ের জোরে বড়ই উদ্দৃপ্ত। কালাপাহাড় বড় বীর। তাঁহার আদত নাম রাজু। তিনি ছিলেন হিন্দুর সন্তান, হইয়াছিলেন মুসলমান। তিনি মুসলমান হইয়া শুধুই যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি ঘোরতর স্বধর্ম্মদ্বেষী হইয়া কালাপাহাড় এই উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন।

আজ এ গ্রাম কাল সে গ্রাম যেখানে দেবমন্দির যেখানে হিন্দুর কীর্ত্তি, কালাপাহাড় সেই সেই খানেই তাহা ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর। দেশশুদ্ধ লোক কালাপাহাড়ের ভয়ে ভীত ব্যতিব্যস্ত। তাহার উপর আবার দেশে রাষ্ট্র যে কালাপাহাড় অচিরেই উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবকে আক্রমণ করিতে যাইবে। বিরজা ভাঙ্গিবে, জগন্নাথদেবকে পোড়াইবে ইত্যাদি নানারূপ অত্যাচার করিবে। এ সংবাদে সকলেই বিশেষ ব্যথিত বিশেষ শঙ্কিত। এমন শঙ্কিত যে কেহ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায় না পাছে কালাপাহাড় আসিয়া অত্যাচার করে। তাই সকলেই যথাসাধ্য একটু দল বাঁধিয়া থাকে, কোথাও যাইতে হইলে দল বাঁধিয়া যায়।

এমত অবস্থায় সুধীরের একাকী দেশত্যাগে রামচন্দ্রপুরের সকলেই বড় ভীত হইল। ভয় কালাপাহাড়ের হাতে পড়িলে পাছে তাহার কোন বিপত্তি ঘটে।

আজ প্রায় এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে সুধীর দেশত্যাগী। অনুসন্ধানও অনেক হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। সুধীরের কোন সংবাদই পাওয়া যাইতেছে না। গ্রামের লোক বড়ই চিন্তাকুল।

জগৎরায় আর বলদেব আচার্য্যকে বুঝাইয়া রাখিতে পারিলেন না। বলদেব নব সুধীরের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। না পাইলে আর ফিরিবেন না ইহাই সঙ্কল্প। তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা।

উষা ভাবিল তবেই হইয়াছে, আচার্য্য দেশত্যাগী হইলেন, জগৎরায় আর কাহার মুখ চাহিয়া সুধীরের অনুসন্ধান করিবেন। উষার শেষ আশার ক্ষীণ আলোকটুকুও নিবিয়া গেল, উষাই তাহাতে আঁধারে ডুবিল। ভাবিল এখন আমার উপায় কি? আমায় পথ দেখাইবে কে? উষার নিভৃতে অশ্রুবিসর্জ্জনই সার হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে।
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম ॥

মানুষ ভাবিয়া উঠিতে পারে না যে আমি কি হইতে কি হইব, কাহা হইতে কি পাইব। মানুষ বুঝিয়া উঠিতে পারে না যে কোন্ ভস্ম রত্ন হবে? কোন রত্ন ভস্ম হইবে। মানুষের যেমন জ্ঞানের সীমা নাই তেমনি তাহার অজ্ঞানও অসীম।

সুধীর আজ এক মাস হইল গৃহত্যাগী। যখন সে গৃহত্যাগ করে তখন অবশ্য অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই তাহা করিয়াছে, কিন্তু এখন সময়ে সময়ে ভাবে কেন করিয়াছি।

সুধীর পুরুষোত্তম যাইতেছে। সঙ্গে সেই সন্ন্যাসী। এখন তাঁহারা জাজপুরের পথে। বেলা অপরাহ্ণ। দুজনে পথ হাঁটিতেছেন। সন্ন্যাসী অক্লান্ত। শরীরে মনে সন্ন্যাসীর কোনও ক্লেশ নাই। তিনি অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, সুধীর পশ্চাতে। সুধীরের গতি ভাবনায় মন্থর। সন্ন্যাসীর তাহা অবিদিত নহে তাই সন্ন্যাসীও মন্থর। সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু স্বরে একমনে গীতা আবৃত্তি করিতে করিতে যাইতেছেন।

সুধীর যাইতেছে আর ভাবিতেছে। ভাবিতেছে এ কি হইল?

এত দিন গেল এমন সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন করিয়া তাঁহার সব উপদেশ শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু কই কিছু তো হইতেছেনা? মনের অবস্থা সাময়িক পরিবর্ত্তিত হইলেও স্থায়িরূপে তাহা হইতেছে না কেন? সন্ন্যাসী যখন উপদেশ দেন তখন তো বেশ বুঝি যে প্রকৃত সন্ন্যাসী হইতে হইলে গৃহত্যাগ করিতে হয় না। তাই সময়ে সময়ে ভাবি কেন গৃহত্যাগ করিয়াছি, যাই আবার গৃহে ফিরিয়া যাই। কিন্তু যখনই গৃহে ফিরিবার কথা মনে হয় তখনই আমার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় সেই মূর্ত্তি!!! সেই আমার প্রাণের পিপাসা হৃদয়ের দেবী—মর্ত্ত্যে স্বর্গের পারিজাত-মূর্ত্তি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়। আর অমনি সন্ন্যাসীর সব উপদেশ ভুলিয়া যাই, মাথা ঘুরিয়া যায় ভাবি এ যদি আমার না থাকে? ইহাকে যদি আমি হারাই সংসারের নৈসর্গিক নশ্বরতার নিয়মে এ যদি আমার ছাড়িয়া যায় তবে আমার কি হবে? আমি পাগল হইয়া যাইব? না আমি গৃহে ফিরিব না। এ যে আমি আজও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে আমার কি রয় কি ভয়, আমি নেই কাহাকে? আমি যখন দেখিলাম সংসার বড় নির্দ্দয়, বড় বিশ্বাসঘাতক, এই তোমাকে তোমার হাতে পূর্ণিমার চন্দ্র ধরাইয়া দিয়া আনন্দ-স্রোতে ভাসাইতেছে। আবার তোমাকে তোমার হাত হইতে উহা কাড়িয়া লইয়া অজস্র ধারায় কাঁদাইতেছে, তখন আমি আমার সেই পূর্ণিমার চন্দ্রকে হাতের নিকটে পাইয়াও ধরিলাম না। ভয়—সেই সং-সারের নির্দ্দয়তায়, ভয় সেই সংসারের বিশ্বাসঘাতকতায় ভয় সেই কান্নায়। ভয়ে গৃহ ছাড়িলাম। ভাবিলাম ভালই করিলাম। সংসারের মুখে পদাঘাত, দেখি সংসার আর আমায় কেমন করিয়া কাঁদায়। এখন আবার সন্ন্যাসীর মুখে শুনিতেছি যে না, তুমি সংসারকে চেননা, অমন করিয়া সংসারের ভয়ে সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া পলাইয়া যাইলেই সং-সারের মুখে পদাঘাত করিতে পারিবে না। তুমি দেখিতে পাইতেছ

না এই তো তুমি কাঁদায় বলিয়া তুমি তোমার সেই তেমন দেবদুর্লভ বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া সংসার ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছ, কিন্তু তুমি তাহাতে সুখী হইতে পারিয়াছ কই? দেখিতেছ না সেই বস্তুর স্মৃতি তোমার চারিদিকে সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর তুমি ছট্‌ফট্‌ করিয়া একবার শূন্য, একবার মহান্‌, একবার বিরাট্‌ এই কত রকমকে পাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতেছ। তুমি ফুলটী দেখনা, লতাটী ছোঁওনা, আকাশে নক্ষত্রমালা দেখিলে শিহরিয়া উঠ, ভয়—পাছে সৌন্দর্য্যফাঁসে সংসার তোমায় ধরিয়া ফেলে। তা এমন সংসারত্যাগে কি সংসারকে পদাঘাত করা হইল, না সংসারের ভয়েই সর্ব্বদা শশব্যস্ত থাকিতে হইল? তা হয়না। সন্ন্যাসী বলেন—অমন করিয়া সংসার ত্যাগ করিলে সংসারের মুখে পদাঘাত করা হয় না। তাহাকে ভয় করিয়া চলিলে চলিবে না। চলিতে হইবে তাহার বুকের উপর পা দিয়া। তুমি সংসার—এই আমায় সুখের দোলায় শুয়াইয়া ঘুম পাড়াইলে,বেশ—ঘুমাইলাম। আবার দুঃখের পেষণীতে অস্থি মজ্জা চূর্ণ করিয়া দিলে, বেশ দিলে। আমার চক্ষের এক বিন্দু জল তোমায় দেখিতে দিলাম না। এইরূপে সংসারে চল সংসার তোমায় দূর হইতে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিবে। ইহারই নাম সংসারের মুখে পদাঘাত।

সম্মুখে আমার এই দুই পথ। এক আমার নৈসর্গিক সংসার বিরাগ, আর এই সন্ন্যাসীর উপদিষ্ট সংসার রাগ। আমি বুঝিতে পারিতেছি না ইহার মধ্যে কোন্‌টী রত্ন, কোন্‌টী ভস্ম? কোন্ রত্নটী ভস্ম হইবে? কোন্ ভস্মটী রত্ন হইবে? আমি বুঝিতে পারিতেছি না আমি কাহা হইতে কি পাইব? আমি কি হইতে কি হইব? এ যে দেখিতেছি সবই অব্যক্ত। মানুষের যেমন জ্ঞানের সীমা নাই, তেমনি যে আবার দেখিতেছি তাহার অজ্ঞানও অসীম।

এমন সময়ে সন্ন্যাসীর মুখে উচ্চারিত হইল,——

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

সুধীরের কর্ণে তাহা বাজিয়া উঠিল। ভাবিল তা তো বটেই, আমার চিত্ত যখন অব্যক্তে আসক্ত তখন আমার ক্লেশ তো অপার। হায় হায়। আমি বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছি না কেন? আমার চিত্ত এমন অব্যক্তে আসক্ত হইতেছে কেন? হায় কে বলিবে কেন? গতি যে অব্যক্ত।

সুধীরের মন এই রকমে ক্রমে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল আর কিছু ভাবিবারও সামর্থ্য রহিল না, একটু বসিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইল।

সুধীরের ভাগ্যক্রমে সুধীর দেখিতে পাইল সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষ। তাহার নিবিড় ছায়া। তখন সন্ন্যাসীকে বলিল,—প্রভু আপনার কি ইহা ব্রত? যাহা পাঠ আরম্ভ করিলে তাহার শেষ করাই কি আপনার নিয়ম?

সন্ন্যাসী বলিলেন—কেন তোমায় কি ভাল লাগিতেছে না?

সুধীর অপ্রতিভ হইয়া বলিল তাও কি কখন হয় প্রভু। আমি একটু বসিতে চাই। নিকটেও ঐ বটবৃক্ষটী দেখা যাইতেছে, উহার ছায়াও বড় শীতল বলিয়া বোধ হইতেছে তাই ওকথা বলিতেছিলাম।

সন্ন্যাসী বলিলেন—চল বেশ বসিগে। তখন উভয়ে গিয়া সেই বট-বৃক্ষের শীতল ছায়ায় গিয়া উপবেশন করিলেন। সুধীরের শরীর ও মন উভয়ই বড় ক্লান্ত হইয়াছিল, তাই সেখানে বসিয়া সুধীর বড় আরাম বোধ করিল।

খানিক পরে সুস্থ হইলে, সুধীর সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া বলিল,—প্রভু অপরাধ লইবেন না, আবার আপনাকে বিরক্ত করিতেছি, জিজ্ঞাসা করি আমার এমন হইতেছে কেন? কেন বুঝিতে পারিতেছি না যে

সংসারকে আয়ত্ত করিতে আমি এখন কোন পথে যাইব? আমার নৈসর্গিক পথে? না আপনার উপদিষ্ট পথে? আপনার উপদিষ্ট পথেই যাইব বলিয়া যখন গৃহে ফিরিতে বাসনা করি, তখন গৃহের সেই—প্রভু! বালকের চপলতা মার্জ্জনা করিবেন—গৃহের আমার সেই প্রভাতরল জ্যোতিটী আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়ায়, আর আমি আপনার উপদেশের সব কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের এই সর্ব্বদোন্মুক্ত করাল গ্রাসের ভিতর তাহার অন্তমনে মণিহারা ফণীর মত যন্ত্রণায় ছটফট্ করিবার ভয়ে সেদিকে চাহিতে পারি না। ভয়, সেই ভয়, সেই চাহিলে যদি আর চোখ ফিরাইতে না পারি তবে সংসার যে আমায় পাইয়া বসিবে। আমি যে সংসারের হাতে পড়িয়া মারা যাইব। প্রভু! তখনি আমার গৃহে ফিরিয়া যাওয়ার কথা অন্তর্হিত হয়, আর আপনার ঐ প্রীতিকর উৎকৃষ্ট উপদিষ্ট পথ যেন কোথায় ধসিয়া যায়। আর আমি আমার সেই শূন্যময় ধ্বকরা মরুভূমির ন্যায় দুরন্ত পথে পড়িয়া হা হা করিয়া বেড়াইতে থাকি। প্রভু! আমার উপর কৃপা করুন। দয়া করিয়া বলুন কোন পথে যাইলে আমি সংসারকে আয়ত্ত করিতে পারিব, কোন পথে যাইলে সংসারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া আনন্দ অনুভব করিতে পারিব। বলুন—

যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে।
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

সন্ন্যাসী সুধীরের সকল কথাগুলিই বড় ধীরভাবে শুনিতেছিলেন। বলিলেন, সুধীর! আমি তোমার সকল কথাগুলিই শুনিলাম। তুমি এত দিন এত কথা বল নাই, আজ সব খুলিয়া বলিলে, ভালই হইল। এখন বল দেখি তোমায় আবার আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি সংসারকে আয়ত্ত করিতে বা সংসারের হাতে না পড়িতে চাহ কেন? বোধ হয় তুমি ইহার উত্তরে এছাড়া আর কিছুই বলিবে না যে আমি সংসারকে আয়ত্ত

করিতে চাহি এইজন্য, যে এ সংসার বড় মায়াবী, এ জীবকে হাসায় কাঁদাইবার জন্য, সুতরাং ইহার মায়ায় পড়িয়া হাসা হইবে না। হাসিলেই বেটা কাঁদাইবে, সুতরাং এ যাহাতে হাসাইতে না পারে, তাহা করা আবশ্যক। অর্থাৎ—তোমার মতে তুমি মনে কর, সংসার যাহা যাহা দিয়া জীবকে হাসায়, সে সব কোন বস্তুর দিকে জীবের তাকান পর্য্যন্ত উচিত নহে। আর তাহা যে করিতে পারিবে সংসারের কাছে সে বেপরোয়া। কেননা সংসারের সাধ্য নাই যে সে তেমন জীবকে কাঁদায়। তাই তুমি গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছ। কেমন এই তো?

আজ্ঞে হাঁ, যুক্ত করে সুধীর বলিল আজ্ঞা হাঁ। সন্ন্যাসী বলিলেন,—উত্তম। কথাও বেশ ভাবও বেশ। কিন্তু কাজটী বড কঠিন। শুধু কঠিন নয়, বোধ হয় অসম্ভব। কেন যে কঠিন আর কেন যে অসম্ভব তাহা বোধ হয় তোমায় আর বড বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না, শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে তুমি তাহা বেশ অনুভব করিতেছ। অনুভব করিতেছ যে তুমি ঐ পথে যাইতে গিয়া কত কষ্ট পাইতেছ। আর তাহা পাইবারই কথা। কেননা দেখ, তুমি যাহাকে আয়ত্ত করিতে চাও, তুমি যে শত্রুকে পরাস্ত করিতে চাও,সে শত্রু বড একটা ছোটখাটর মধ্যে নয়। তাহার নাম সংসার। তাহা অপেক্ষা প্রবল আর আছে কে? তুমি তার কোন্ হাসানফাঁদে পা না দিবে? সে কিসে হাসায়, কিসে কাঁদায়,তাহা কি গণিয়া ঠিক করা যায়? না বুঝিয়া উঠা যায়? যে তাহার সে ফাঁদ তুমি এড়াইয়া যাইবে? তাহারতো যো নাই। লাভের মধ্যে ওপথে যাইতে হইলে মনে সর্ব্বদাই আশঙ্কা ঐ বুঝি সংসার আমায় ধরিল। এক কথায় বলিতে গেলে ওপথে যাওয়ার নাম সংসারের ভয়ে পলায়ন। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? তাই ওপথে যাইতে গেলে মন সর্ব্বদাই অশান্ত থাকে। তাই তুমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছ না।

আর আমার পথ—আমি তোমায় যে পথে যাইতে বলিতেছি, তাহা

এককথায় বলিতে গেলে বলিতে হয কি, না সংসারের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করা। অর্থাৎ—সংসার তাহার মায়াবলে আমায় পরাভূত করিয়া কাঁদাইতে চাহিতেছে আর আমি করিতেছি কি, না ধৈর্য্য-কঞ্চুকে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তাহাব প্রেরিত প্রত্যেক বলেবই সম্মুখে অবলীলাক্রমে হাস্যমুখে পাদচাবণা করিতেছি। সংসারের কোন বলেরই সাধ্য হইতেছে না, যে আমার মর্ম্মে প্রবেশ করে। কেননা আমার কঞ্চুক যে অভেদ্য। কাজেই আমারই জিত হইল। সংসার হারিয়া গেল। বুঝিলে আমাব পথের এই ভাব। এ পথে যাইতে হইলে দেখ কেমন নির্ভীক হইয়া যাওয়া যায। ভয় না থাকিলেই উদ্বেগ থাকে না। উদ্বেগ না থাকিলে আর অশান্তি কোথায়? শান্ত-হৃদযই চিরসুখী। কেমন বুঝিতে পারিতেছ কি?

সুধীব বলিল,—আজ্ঞে হাঁ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আপনার ঐ কঞ্চুক সংগ্রহ করা কি সহজ ব্যাপাব?

না। সন্ন্যাসী বলিলেন,—না সহজ নহে। কিন্তু একেবাবে অসম্ভব নহে। অভ্যাস করিতে আবম্ভ করিলে ও কঞ্চুক পাওয়া যাইবে। দেখ ধৈর্য্য নামক পদার্থতো তোমাব অবিদিত নহে। উহা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেরই হৃদয়ে আছে। তোমারও কিছু না কিছু আছে। তা উপস্থিত সেই স্বল্পমাত্রার ধৈর্য্য লইয়াই সংসারের সম্মুখে অবতীর্ণ হও, আর উহা দিয়া হৃদয় দুর্ভেদ্য করিব এই সঙ্কল্প করিয়া সংসারে বেডাও দেখিবে উহা বাড়িতেছে, আর সংসারও ক্রমে তোমার আয়ত্ত হইয়া আসিতেছে। তখন দেখিতে পাইবে এ পথ কত সুখময়। দেখিতে পাইবে এ পথ কেমন আনন্দময়। এ পথে হাসিতেও পারা যায, অথচ কাঁদিতে হয় না। তোমার পথের মত এ পথ অন্ধকারময় বিজন আনন্দ-শূন্য ভযঙ্কব নহে। এ পথে চাঁদ ওঠে, জ্যোৎস্না ঝরে, পাপিয়া ডাকে, মলয় পবন বেড়িয়া বেড়ায়। তোমার পথের মত এ পথ উত্তপ্ত ও শ্মশান-

দৃশ্য ভীষণ নহে। এ পথ "রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ পলাশৈঃ" এ পথ 'ছায়াদ্রুমৈ নির্যমিতার্কমরীচিতাপঃ"। যাও সুধীর এই পথ দিয়া সংসারে প্রবেশ কর, আনন্দ পাইবে। তোমার ও কুপথ পরিত্যাগ কর।

সুধীর চুপ্। সুধীরের বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই। ভাবিল,—আমি কি এতই অজ্ঞানী !!!

সন্ন্যাসী বলিলেন,—আচ্ছা আজ এই পর্য্যন্ত। চল আজ আরও কিছু এগিয়ে যাওয়া যাক্।

তখন আবার দুজনে সেইরূপে পথ চলিতে থাকিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উদ্যোগ।

উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব চরমুখে সংবাদ পাইয়াছেন যে কালা-পাহাড উডিষ্যাবিজযের জন্য সুসজ্জিত। সংবাদ পাইয়াছেন—যে কালা-পাহাড পুরুষোত্তমে আসিবে, জগন্নাথদেবের বিগ্রহ ভস্ম করিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ কবিবে। যাজপুরে আসিবে, বিরজামূর্ত্তি চূর্ণ করিবে, আরও যেথানে যাহা হিন্দুর দেবতা আছে সব ধ্বংস করিবে, কালাপাহাডেব ইহাই প্রতিজ্ঞা।

সুলেমান—একবার বিধ্বস্তসর্ব্বশক্তি সুলেমান, জানেন মুকুন্দ-দেবের কত শক্তি, উড়িষ্যা আক্রমণ কত দুষ্কর, আর সেই হিন্দুর জগন্নাথ কত দুর্জয়। কিন্তু আজ কালাপাহাড় তাঁহার সেনাপতি। হিন্দুর আপন শক্তি আজ শত্রুর করতলগত, হিন্দু দুর্ব্বল না হইবে কেন?

সুলেমান ভাবিলেন, এইবার দেখিব। মুকুন্দদেবের কত শক্তি, এইবার একবাব দেখিয়া লইব। তাহার বলে তাহাকেই পরাজিত করিব। ব্রাহ্মণসন্তান রাজু যখন মুসলমান হইয়াই কালাপাহাড় হইয়াছে তখন আব আমার চিন্তা কি? হিন্দুর দেবতা হিন্দুর হস্তেই বিনষ্ট হইবে। সুলেমান মহানন্দে মহম্মদের নাম করিয়া বিপুল সৈন্যসহ কালাপাহাড়কে উড়িষ্যাবিজয়ে প্রেরণ করিতে স্থির করিলেন।

মুকুন্দদেব সব সংবাদই জানিতে পারিলেন। কিছু ব্যাকুল হই-লেন। কিন্তু তাঁহার অসীম সাহস। বিশেষ সম্রাট্ আকবর তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষক। তিনি অবিলম্বে আকবরকে এ সংবাদ পাঠাইলেন ও নিজেও যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

আকবর হিন্দুস্থানের অধীশ্বর। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে তিনি স্থিরসঙ্কল্প। আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া একবার বাঙ্গালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন সুলেমান কিরাণী বাঙ্গালার কর্ত্তা। খানজামান তাঁহার বন্ধু, আর খানজামানের কন্যার দৌলতে হিন্দু রাজু মুসলমান হইয়া কালাপাহাড়রূপে সুলেমানের সেনাপতি। পাঠানদের বলবীর্য্য তাঁহার অবিদিত ছিলনা তাই তিনি বাঙ্গালার সাম্রাজ্যের জন্য কিছু ব্যাকুল হইলেন। মুসলমান নরপতি গণের মধ্যে আকবরের তুল্য বুদ্ধিমান্ কে? আকবর জানিতেন ভারতে মোগলসাম্রাজ্য স্থাপন করিতে হইলে ভারতের বল চাই। তিনি তাহাই পাইবার চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা ফলবতী হইল। রাজ-পুতনার প্রধান শক্তি রাজা মানসিংহ তাঁহার হইলেন। টোডরমল্ল তাঁহার হইলেন। ক্রমে আকবরের সততায় প্রায় হিন্দুমাত্রেই আক-বরের হইল। আকবর মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় ভারতে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

হিন্দুকে আপনার করিয়া লওয়াই আকবরের একটী প্রধান কার্য্য ছিল। তাই আকবর বাঙ্গালার জন্য ব্যাকুল হইলেও একটা সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। আকবরের ভাগ্যক্রমে সে সুযোগও মিলিয়া গেল। আকবর সংবাদ পাইলেন উড়িষ্যার মুকুন্দদেব বেশ পরা-ক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তখনই তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মুকুন্দ-দেবের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। তিনি দূতস্বরূপে তাঁহার প্রধান কোষাধ্যক্ষ হোসেন খাঁকে মুকুন্দদেবের নিকট পাঠাইয়া

দিলেন। সঙ্গে রামচন্দ্র মহাপাত্র—আঁকবর সভার অন্যতম প্রধান গায়ক। মহাপাত্র একজন প্রতিষ্ঠিত ও উড়িষ্যাবাসী সুতরাং তাঁহাব সাহায্যে হোসেন খঁা অনায়াসে মুকুন্দদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইলেন। আকবরের সহিত মিত্রতা করিয়া মুকুন্দদেব আরও পরাক্রান্ত হইযা উঠিলেন। তখন হোসেন খঁার পরামর্শে একবার বাঙ্গালা আক্রমণ করিলেন। সুলেমান মুকুন্দদেবকে চিনিতে পারিলেন। ইহার পর হইতেই সুলেমানের বৈরনির্য্যাতন স্পৃহা।

এখন সুলেমান কালাপাহাড়কে পাইযা দ্বিগুণ উৎসাহে উড়িষ্যার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মুকুন্দদেব এ সংবাদ আকবরের নিকট প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র মহাপাত্রই দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন।

মুকুন্দদেব নিশ্চিন্ত নহেন। তিনি যাজপুরে সুলেমানের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। বিরজা যাইবেন ভুবনেশ্বর যাইবেন, জগন্নাথ যাইবেন, হিন্দুর সমস্ত দেবতা, সমস্ত কীর্ত্তি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে, হিন্দুর প্রাণে তাহা সহিবে কেন? "দেবতা হারাইয়া প্রাণে কাজ কি? দেবতার জন্য প্রাণ যাউক" ভাবিযা সমস্ত উড়িষ্যাবাসী এককাট্টা হইল। যাজপুরে যুদ্ধের বিরাট্ আযোজন হইতে লাগিল।

যাজপুর নগরীর উত্তর পার্শ্ব দিয়া বৈতরিণী নদী প্রবাহিতা। বৈতরিণী প্রবল নদী। উহা পার না হইলে বাঙ্গালা হইতে যাজপুরে প্রবেশ করিবার পথ নাই। মুকুন্দদেবের ইহাই এক সাহস। বৈতরণীর দক্ষিণ তীর সৈন্যশ্রেণীতে সজ্জিত হইতে থাকিল। সারি গাঁথিয়া কামান সব রক্ষিত হইল। অমন পরিখা পার হইয়া কাহার সাধ্য নগর আক্রমণ করিতে পারে? নগরবাসীরা কতক নিশ্চিন্ত হইল।

বৈতরিণী পার হইয়া সহজে কাহারও নগরে প্রবেশ বা নির্গম করিবার যো নাই। স্থানে স্থানে ঘাঁটি। প্রবেশ বা নির্গম করিতে হইলে

ঘাঁটির দ্বার দিয়াই করিতে হইবে। ঘাঁটির দ্বার সব বিশেষ বিশেষ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা রক্ষিত। সুতরাং যাওয়া আসা বিশেষ পরিচয় ভিন্ন হইবার উপায় নাই। রাজার আজ্ঞা কাহার সাধ্য অমান্য করে।

যাজপুর বিরজাক্ষেত্র। হিন্দুর তীর্থ স্থান। শক্তিস্বরূপিণী বিরজা দেবী যাজপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এখানে মা'র আমার আড়ম্বর নাই। মা মহিষমর্দ্দিনী বটেন, কিন্তু দশভূজা নহেন। মা এখানে কেবলমাত্র দ্বিভূজা। তাহার উপর মা এখানে একাকিনী সঙ্গে কেহ নাই, কার্ত্তিক নাই, গণেশ নাই, লক্ষ্মী নাই, সরস্বতী নাই, এমন কি মার বাহনটী পর্য্যন্ত নাই। তবু মা মহিষমর্দ্দিনী। আশ্চর্য্য কি মা যে আমার সাক্ষাৎ শক্তিময়ী। তাঁহার আর কিছুতে কাজ কি? তিনি সর্ব্বময়ী। তিনি থাকিলেই যে সব থাকিল। মা আমার এখানে তাঁহার দুই হস্তের বলেই শত্রুদলনে নিযুক্তা। তিনি মহিষাসুরকে বধ করিতেছেন। দুই হস্তের বলেই বধ করিতেছেন। বামহস্তে মহিষের লাঙ্গুল ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের এক শূলাঘাতেই মহিষকে বধ করিতে উদ্যতা। মা! তুমি শক্তিময়ী তোমার জয় হউক। আমরা আর কিছুই চাহি না, কাহারও সাহায্য চাহি না, কেবল তুমি প্রসন্না হও, আমরাও তোমার মত আমাদের দুই হস্তের বলেই কালাপাহাড়কে বধ করি। শত শত কাতর কণ্ঠ এই শব্দে বিরজার মন্দির আকুল করিয়া তুলিতেছে।

নদীতীরে সপ্তমাতৃকারূপে সপ্তশক্তি অধিষ্ঠিতা। ব্রাহ্মণেরা সেখানেও শক্তির উপাসনায় ব্যাপৃত।

নগরময় মহাধুম। যেন নগরময় শক্তি কিছুরই অভাব নাই। এখন বিধাতার ইচ্ছা। মুকুন্দদেবের ভাগ্যে এখন বিধাতা অনুকূল হইলেই হয়।

দেখিয়া শুনিয়া হোসেন খাঁ বিস্মিত হইয়া গেলেন ভাবিলেন হিন্দুর

অদৃষ্ট মন্দ নহিলে ইহার কাছে কি মুসলমান। আকবরের জয় হউক। সব হিন্দু আকবরেব হউক।

মুকুন্দদেব একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন খাঁ সাহেব ঠিক হইতেছে তো?

খাঁ সাহেব বলিলেন, আকবরের অভিলাষ পূর্ণ হউক। আকবরেব বন্ধু জয়ী হউন।

মুকুন্দদেব মনে মনে ভাবিলেন,—পাঠান আমার পরম উপকারী। নহিলে আকবর আমার বন্ধু হইতে আসিবেন কেন? জয় মা শক্তি-রূপিণি। প্রসন্না হও। প্রকাশ্যে বলিলেন,—খাঁ সাহেব মহাপাত্র দিল্লীতে পৌছিবেন কবে?

খাঁ সাহেব বলিলেন,—আপনার অপরিমিত বল। সম্রাট্ শীঘ্রই মহারাজকে বিজয়ী দেখিতে পাইবেন।

মুকুন্দদেব বলিলেন,—বড়ই সৌভাগ্য আজ মোগলকেশরী আমাদেব পবম বন্ধু।

খাঁ সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন, ভাবিলেন,—মোগলের সাম্রাজ্য বীরত্বে নহে অদৃষ্টে।

নবম পরিচ্ছেদ।

মনীষিতা' সন্তি গৃহেষু দেবতা
স্তপঃ ক বৎ'স দচ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলব'
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ॥

সন্ধ্যা বলিল,—উষা! ভাবনার কি শেষ হইবে না?

উষা বলিল,—দিদি আশীর্ব্বাদ কর।

উষা আব সে উষা নাই। উষা এখন আর সন্ধ্যার কাছে গলদঘর্ম্ম হয় না। সুধীব নাই, সন্ধ্যার কাছে উষার আর এখন লুকাইবার কিছুই নাই। এই দেখিতে পাইল, এই বুঝি দিদি জানিতে পারিল, উষার আর এখন সে সব ভাব নাই। মৃগ আর ঘুরিয়া বেড়ায় না, কি যে একটা হইয়াছে ভাবিয়া হরিণ আব অস্থির হয না। তাহাব কস্তুরী এখন স্থানচ্যুত। সে জানিতে পারিয়াছে তাহার কি ছিল। হরিণ বুঝিয়াছে লোকে জানিতে পারিয়াছে যে কস্তুরী আমারই। তবে আব এখন লুকাইয়া কাজ কি? এখন বরং তাহা আমার বলিয়া কাহাকেও জানাইতে পারিলেই সুখ। নহিলে তাহাতো গিয়াছে, আব কি লুকাইয়া সুখী হইব? উষা এখন বরং সন্ধ্যাকে পাইলে সুখী হয। প্রাণ খুলিয়া দুটো অতীতের কথা কহিতে পায উষার

এখন তাহাই সুখ। উষা বুঝিযাছে সন্ধ্যা দিদি হইলেও সখী। অবস্থার বলে উষাও এখন একটু গম্ভীরা হইয়াছে।

সন্ধ্যা বলিল,—উষা ! তপস্যা করিয়া দেবতার আকাঙ্ক্ষা কেন? তোমার দেবতার অভাব কি?

উষা বলিল,—দিদি আমি দেবতা চাহিনা। দেবতার আরাধনা বড মধুর।

উত্তর শুনিয়া সন্ধ্যা বুঝিল উষা মরিয়াছে। সন্ধ্যা উষার এ অকাল মৃত্যুতে অবশ্য কাঁদিত, কিন্তু সন্ধ্যা দেখিল উষা মরিয়া দেবতা হইয়াছে। তাই না কাঁদিয়া সন্ধ্যা সবিস্ময়ে উষার দেবমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

উষা বলিল,—দিদি আমায় রক্ষা করিও। তুমিতো সবই জান আমায় পাযে ঠেলিও না।

সন্ধ্যা মনে মনে ভাবিল,—তা পরিবনা। এ যে রকম সব গতিক দেখিতেছি, তাহাতে তো একা আমি তোমায রক্ষা করিতে পারিব না। তবে দেখি যদি তাঁহাকে সহায় পাই তোমাকে রক্ষা করিব। প্রকাশ্যে বলিল,—উষা বাপ্‌মাকে জবাব দিবে কি? তাঁহারা যে তোমার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন?

উষা শুনিয়া এতটুকু হইয়া গেল।

সন্ধ্যা রকম সকম দেখিয়া ভাবিতে লাগিল,—কি বিপদ্? কাহাকে কিবলিয়া বুঝাইব? উষা যতই কেন চাপিয়া রাখুক না, তবু উষাকে দেখিয়া উষার মা বাপ আজ দিন কতক ধরিয়া আমাকেই জিজ্ঞাসা কচ্চেন "উষার কি হোয়েছে?" প্রথমে তো এ একটা জবাব দিবার কথা বলিয়া মনেও করি নাই। তাই তাহার উত্তরে বলিয়াছিলাম ও কিছুই নয় বিবাহ দিলেই সেরে যাবে। কেননা ভাবিয়াছিলাম বাস্তবিকই উহা কিছুই নয়। শুধু ছেলেখেলা, খেলার ঠাকুরগড়া। উহার প্রাণ প্রতিষ্ঠাও নাই। উহার পূজাও নাই। তবে তখন দুটো একটা তামাস

করিতাম, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দেব বলিয়া একটু রঙ্গ করিতাম। তা তাহাতে তো তখন কোন দোষ দেখি নাই। বরং যদি সেই বলার দরুণ খেলার ঠাকুর সত্যি হ'ত', ভালই তো হ'ত'। আপনার হাতে গড়া ঠাকুর পূজা করিয়া বিশেষ সুখ হইত। তা তাহা হইল না। খেলার ঠাকুর ভাঙ্গিয়া গেল। না হয় তাহাকে বিসর্জনই বল। হ'ল' হ'ল' খেলার ঠাকুরের বিসর্জনই হইয়া গেল। হ'ল'ই বা? খেলার ঠাকুর বই ত নয়? খেলার ঠাকুরের বিসর্জ্জনে কি দুঃখটা এতই হবে? যদি বল দেখিতেছনা আমার ঐ ঠাকুরের বিসর্জনে কত লোকের দুঃখ? তা হোলেই বা? আমারও তো দুঃখ। আহা! বেশ ছিল। কেমন সুন্দর গঠন, কেমন রূপ, কেমন গুণ, দেখিলে না হয় কেমন একটু সুখ পাইতাম। তা তাহা চলিয়া গেল। গেল গেলই। সংসারে তো এমন কত কি চলিয়া যায়। কিছু দুঃখিত হইলাম, পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলাম, পাইলাম না। তা আর কি করিব ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম। ভাবিয়াছিলাম,—আমি বা এ গ্রামের আর সবাই যেমন "তা আর কি করিব" বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়াছে উষাও বুঝি তাই দিবে। না হয় আমাদের অপেক্ষা দুদিন পরে দিবে। কিন্তু ক্রমে এখন যে দেখিতেছি তা নয়। এ যে খেলার ঠাকুরের মত ঠাকুর নয়। উড়াইয়া দিবার তো যো নাই। এ যে দেখিতেছি উষার আসল প্রতিমা!!! শুধু সাদা কথায় আমরা সমাজের যে সব ঠাকুরকে প্রতিমা বলি তাহা হইতে ইহা আবার আকাশ পাতাল তফাৎ। সমাজের প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় শুধু গোটাকতক কথায়, গোটাকতক মন্ত্রে, তাহার পর তাহার পূজা হয় তাহাও কথায়, তাহার পর বিসর্জনও মন্ত্রে, বেশ ফুরিয়ে যায়। সমাজের প্রতিমার প্রতিষ্ঠা বল, পূজা বল, বিসর্জন বল, সবই এই রূপ কথায় কথায় হইয়া যায়। প্রাণের সঙ্গে কোন একটা সম্পর্কই থাকে না। তাই দেখিতে পাওয়া যায় সমাজের প্রতিমার বিসর্জ্জনেও কত ধুম।

কিন্তু উষার এ প্রতিমাখানি তো তাহা নহে। ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা শুধু কথায় হয় নাই। বালিকা উষা আপনার প্রাণ দিয়া ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। আজ সেই প্রতিমার বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে। হায়! হায়! আমরা কেমন করিয়া বুঝিব যে এবিসর্জ্জন সমাজের প্রতিমার বিসর্জ্জন নয়? কেমন করিয়া বুঝিব যে এ প্রতিমার বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে একটী বালিকা প্রাণ হারাইয়া ফেলিযাছে? তাই সেটী এমন দিন দিন আমরাইযা যাইতেছে? আগে এত বুঝি নাই বলিয়াই উষার বাপ মায়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিযাছিলাম উহা কিছুই নহে। কিন্তু এখন যে দেখিতেছি বড় বিপদ্। একেতো কি করিয়া মেয়েটীর জীবন ফিরিযা আনা যায় সেই ভাবনা, তাহার উপর আবার উষার বাপ মা উষার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন। সে তো আরও বিপদ্। বিবাহ কার? যে মরিয়া গিয়াছে তাহার আবার বিবাহ কি?

সন্ধ্যা বড়ই বিপদে পড়িল। সন্ধ্যা বিপদে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু আমরা বলি পড়িযাছে পড়ুক, উহা বিপদ নহে আনন্দ। এ বিপদ্ সকলের ভাগ্যে হয় না, সকলের কপালে ঘটিয়া উঠে না। সংসারে আসিয়া অনায়াসে পরের ভাবনা ভাবিবার শুভাদৃষ্ট না থাকিলে বুঝি এরূপ বিপদ্ হয় না। সন্ধ্যার সে শুভ যোগটী আছে। যেহেতু সন্ধ্যা সংসারী হইয়াও সংসারী নহে। কেননা লোকের মতে সন্ধ্যার যখন ছেলে পিলে নাই, তখন কি লইয়াইবা সন্ধ্যার সংসার। নাই হউক, সন্ধ্যা সংসারী নাই হউক। উহাই শুভাদৃষ্ট। সন্ধ্যার উহাই শুভযোগ যে সন্ধ্যা সংসারী নহে। আর সংসারী নহে বলিয়াই না আজ ঐ অকূল পাথারে ভাসমানা বালিকাটীর সন্ধ্যাই একমাত্র অবলম্বন! নহিলে কে দেখিত? সংসারী সব আপনার জ্বালায় আপনি ব্যস্ত, কে দেখিত ঐ আধ ফুটন্ত মল্লিকা ফুলটী শুকাইয়া যাইতে বসিয়াছে? কাহার তাহাতে প্রাণে ব্যথা লাগিত? কে তাহার

জন্য আপনাকে বিপন্ন বলিয়া মনে করিযা মেয়েটীকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিত? কেহই নহে। ফুলটী আপনিই শুকাইত, আপনিই ঝরিত, ক্রমে আপনিই বিলুপ্ত হইত, সংসারে কেহই তাহার খবর রাখিত না। সংসার একটী অমূল্য রত্নে বঞ্চিত হইত। সন্ধ্যা সংসারী নহে বলিয়াই না আজ আমরা উষার খবর লইবার লোক দেখিতে পাইলাম। দেখিতে পাইলাম—ঐ একটী অদ্‌ভুত ক্ষুদ্র প্রাণ, যে প্রাণে অত প্রেম যেন এক কলা চন্দ্রে ষোলকলার জ্যোৎস্না, তাহা দেখিবার একটী লোক মিলিযাছে! শুধু দেখিতে নহে, সেটী না অকালে অস্ত গিয়া সংসারকে একটী অমূল্য রত্নে বঞ্চিত করে, তাহার জন্য যত্ন করিবার লোক মিলিয়াছে। ইহা কম আনন্দের কথা নহে। তাই বলিতে ছিলাম, সন্ধ্যা বিপদে পড়িয়াছে পড়ুক, উহা বিপদ নহে, আনন্দ।

তা বিপদই হউক, আর আনন্দই হউক, সন্ধ্যা যোদ্দা বড ফাঁপরে পড়িযাছে। এক দিকে উষার বিবাহ, আর এক দিকে উষার মৃত্যু। সন্ধ্যা বড় গোলমালে পড়িযা আবার উষাকে জিজ্ঞাসা করিল "উষা মা বাপকে জবাব দিবি কি?

উষা নিরুত্তর।

সন্ধ্যা দেখিল,—উষা কথা কহিতেছে না। ভাবিল,—কথা কহিবেই বা কি? এ প্রশ্নের যে উত্তর নাই। তখন সস্নেহে উষার হাত ধরিযা সন্ধ্যা বলিল,—উষা! দিদি আমার! তোমার এ শিরীষকোমলপ্রাণে কোকিলের পদাঘাত কেন?

উষা কাঁদিয়া ফেলিল।

উষার কান্না দেখিয়া সন্ধ্যারও চোক মুছিতে হইল। ভাবিল আর কাঁদা কাটিতে কাজ নাই, এখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। উষার বিবাহের উদ্যোগ এখন বন্ধ করাইতে হইবে। যাই দেখি

আমার বলের সাহায্য লই। প্রকাশ্যে বলিল,—উষা কাঁদিও না কাঁদিতে হয় দুজনে কাঁদিব শান্ত হও আমাকে পর ভাবিও না।

উষা চোখ মুছিল। বলিল,—দিদি কি হবে?

সন্ধ্যা বলিল,—ভয় নাই। আমি তাহার উপায় করিতেছি। তুমি ব'স' আমি আসিতেছি, বলিয়া সন্ধ্যা তাহার বলের সন্ধানে যাইল। সন্ধ্যা স্বামীর কাছে ছুটিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

"তুমি এই বসন্তের কালে বর্ষা দেখিলে এ কি হইল ভাবিয়া বিস্মিত হও। কিন্তু যে মনে করে বসন্ত আমার, আমি বসন্তের, বসন্ত আমার সর্ব্বস্ব, নহিলে আমি ছাই। বলিতে পার? তাহার এ প্রকৃতিবিপর্যযে কি হয়। সে কি হইয়া যায়?" গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে সন্ধ্যা ভ্রুকুটীকুটিলচক্ষে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল,—মনে মনেও কখন এ সব কথা উদয় হয় কি?

হৃষীকেশ বসিয়া কি একখানি পুস্তক পড়িতেছিলেন। সন্ধ্যার সাড়া পাইয়া তাহার পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তাইতো মহাশয়! ব্যাপারখানা কি? একেবারে বেত উঁচিয়ে যে?

"আজ তোমার পরীক্ষে" সন্ধ্যা হাঁসিতে হাঁসিতে অপেক্ষাকৃত একটু মৃদুল দৃষ্টিতে বলিল,—শুধু বসিয়া বসিয়া পড়িলে হয় না। আজ পরীক্ষা দিতে হইবে। আজ তোমার পরীক্ষে।

"তবু ভাল" হৃষীকেশ সন্ধ্যার চোকের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—তবু ভাল, বেত গাছটা একটু নামাইলে।

সন্ধ্যা বলিল,—তামাসা নয়, বেতে কিছু হ'বে না। না বলিতে পারিলে হাজতে থাকিতে হইবে। এ যে সে লোকের নিকট পরীক্ষে

নয়, এ কাজীর নিকট পরীক্ষে। বলিয়া সন্ধ্যা হৃষীকেশের কাছে আসিয়া কিছু জাঁকিয়া বসিল।

হৃষীকেশ তখন যোড়হাত করিয়া বলিলেন,—তবে খোদাবন্দ হুজুরে সেলাম পৌছে। গোলামের বেআদবী মকুব হয়। গোলাম উত্তর করিতে পারিল না। গোলামকে হাজতেই দেওয়া হউক। আর যাহাতে গোলাম কিছু দিন হাজতেই থাকিতে পায় তাহার জন্য বরং গোলাম কিছু ঘুস্ দিতে চায়।

"বটে গো বেআদব" বলিয়া সন্ধ্যা হৃষীকেশের গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাজতের ব্যবস্থা করিল। হৃষীকেশও হাজতে থাকিয়া কাজী সাহেবকে লুকিয়ে চুরিয়ে বেস কিছু কিছু যে ঘুস্ না দিতে লাগিলেন তাহা নহে, তবে কাজী সাহেবের প্রবল প্রতাপ, কাহার সাধ্য যে তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে।

এইরূপে আপোষে যখন ক্রমে ক্রমে পরীক্ষাব্যাপার সমাপন হইল তখন সন্ধ্যা স্বামীর হাতখানি আপনার হাতে তুলিয়া লইয়া আঙ্গুলের আগাগুলি ধীরে ধীরে টিপিতে টিপিতে বলিতে লাগিল,—এখন বাস্তবিকই বল দেখি উষার কি হবে ?

হৃষীকেশ বলিলেন,—একথা তো আজ এই ক'দিন ধরিয়াই শুনিয়া আসিতেছি। আজ এমন করিয়া ভাবিবার কিছু নূতন দেখিয়া আসিলে নাকি ?

সন্ধ্যা। নহিলে কি সত্যি সত্যি শুধুই রঙ্গ ?

হৃষী। তাত' নয় দেখিতেছি।

সং। এখন উপায় ?

"তাইতো" বলিয়া হৃষীকেশের মুখ কিছু গম্ভীর হইল।

সন্ধ্যা স্বামীর মুখ দেখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মনে মনে ভাবিল

এইবার উষার দুঃখ বুঝা পূরা হইল। প্রকাশ্যে বলিল,—এইবার বুঝিলে কি, বসন্তকালে এই আকস্মিক বর্ষায় কাহার কি হইযাছে ?

হৃষীকেশ বলিলেন,—বুঝিতেছি তো, কিন্তু ও যে বড ছে'লমানুষ, ওর ভিতরে এত ইহা যে বুঝিযা উঠিতে পারিতেছি না।

সন্ধ্যা সগর্ব্বে বলিল,—দেখ, বিধাতার অবিচার, সাগর বেলা অতিক্রম করে না, তা সে কেমন করিযা বুঝিবে যে পাহাড়ের ঐ অতটুকু উৎস কত মরিযা !

হৃষীকেশ হাসিলেন, বলিলেন,—"আ মরি! কেবল দেশ ভাসানই কাজ" বলিযা সন্ধ্যাব গাল দুটি টিপিয়া ধরিলেন।

সন্ধ্যাও হাসিল, বলিল,—সে দোষ কাহাব ? সাগর আগে শুকাইযা যাউক, নদী ফিরিযা গিযা চুপ করিযা পাহাডের কোলে গিযা বসিযা থাকিবে। বলিয়া স্বামীর দিকে একটা বিলোল কটাক্ষপাত করিল।

হৃষীকেশ মনে মনে ভাবিলেন,—ছাই সাগরের প্রেম। তুমি প্রকৃতিপেলবা প্রবাহিণী, তোমাব গুণেই সাগব প্রেমময়। প্রকাশ্যে বলিলেন,—সন্ধ্যা ও সব বড়াই ছাড, এখন কাজের কথা কও, তুমি উষাব মা'র ভার লও, আব আমি জগদীশ্বব বাযকে বুঝাইতে পারিব।

সন্ধ্যা। মাগী মেযের বিযে বিযে করে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। মাগী রোগ না বুঝে আপন মনে ঔষধের ব্যবস্থা কচ্চে।

হৃষী। তাই বলিতেছি তুমি সেখানে কবিরাজী কর, ধীরে ধীরে রোগী বুঝাইবার চেষ্টা কর। জগদীশ্বরকে বুঝাইতে আমার বোধ হয় বড কষ্ট পাইতে হইবে না।

সন্ধ্যা। তা যেন হ'ল' উপস্থিত দিন কতকের জন্য যেন বিযে বন্ধ করবার বন্দোবস্ত করিলাম, কিন্তু সে ক'দিন চলিবে ? তারপর কি হবে ?

হৃষী। তাহার জন্য এখনই মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই। সম্মুখে ব্যাপার বড় বেশী, তুমি উপস্থিতটা রক্ষা কর।

সন্ধ্যা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল,—সে কি? সম্মুখে কিসের বড় ব্যাপার?

হৃষীকেশ বলিলেন,—দেখ সম্মুখে বড়ই অশান্তি আসিবার সম্ভাবনা। কালাপাহাড় উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেবের সহিত লড়াই করিতে যাইতেছে। বিরজা উড়াইবে, ভুবনেশ্বর ভাঙ্গিবে, জগন্নাথ পুড়াইবে, নূতন মুসলমানের ইহাই প্রতিজ্ঞা। তাহার উপর আবার আমাদের বাজা সুলেমান বলেন, তোমরা আমার রাজ্যে বাস কর', তোমরা হিন্দু বটে, তথাপি যখন আমার রাজ্যে বাস কর', তখন আমার এ বৃহৎ কার্য্যে যোগ দেও, টাকা দিয়া সাহায্য কর', না কর' সপুরী একগড় করিব। দেশের যে যেখানে রাজা জমীদার আছেন সকলের উপরই সুলেমানের এই হুকুম। আমাদের জগৎ রায়ও এ হুকুম পাইয়াছেন। তিনি হুকুম পাইয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। হিন্দু কি করিয়া হিন্দুর দেবতানাশে সহায়তা করিবে জগৎরায় তাহাই ভাবিতেছেন। বোধ হয় তাঁহাকে অচিরেই এ স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। মুসলমানের ক্রোধে পড়িলে আমাদেরও নিস্তার নাই,বোধ হয় অনেককেই জগৎ রায়ের সঙ্গ লইতে হইবে। সুতরাং কোথাকার জল যে কোথায় মরিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। তাই বলিতেছি উপস্থিত বেগটা তো এখন কমাইয়া দেও, ভবিষ্যতের জন্য এখন মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই।

সন্ধ্যা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল,ভাবিল,—তাইতো আমি বসন্তকালে শুধু ঐ লতাটীর উপরেই আকস্মিক বর্ষার বেগ দেখিয়া কাঁদিতেছিলাম, কিন্তু এ যে দেখিতেছি একেবারে বর্ষা ঋতু! ইহার বেগে তো কিছুই থাকিবে না। ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যা শিহরিয়া উঠিল, বলিল,—এত কাণ্ড, কই এতদিন তো কিছু বল নাই?

হৃষীকেশ হাসিলেন, বলিলেন,—জানিতে পারিলে বুঝি এতদিন লড়াইটা ফতে করিয়া ফেলিতে ?

সন্ধ্যা রাগিয়া বলিয়া উঠিল,—মনে ক'রেছ কি ? বড ভয় নাকি ? আমরা কি আমাদের লক্ষ্য করি, নহিলে তোমরা কে ? তোমরা আমাদের স্বামী কেন ? জান, আমরা মরিতে জানি, তোমার ও লড়াইতে আর কিসের এত ভয় ?

হৃষীকেশ আর ও হাসিলেন, বলিলেন,—বাহবা ! কুচ পরোয়া নাই, এইবার মুলেমানের মুণ্ড ঘুরিয়া যাইবে।

সন্ধ্যা আর ও রাগিল, বলিল,—আর কাঁকে কাজ নাই, তোমাদের ও পুরুষের মুণ্ড ঘুরাইতে আর লড়াই করিতে হয় না।

হৃষী। তবে আর কি ? একবার গিয়া পাশে দাঁড়াও।

সন্ধ্যা। তা বইকি ? তোমাদের হাতে পড়িয়া পৃথিবী আর কি করিবে ? পরের কাছে আপনা খাইয়া তোমাদের সেবা করিবে ? তোমাদের যে পুঁরুষকার। ছি! বলিতে লজ্জা হয় না ? বলিয়া সন্ধ্যা কিছু বাগত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন হৃষীকেশ বলিলেন,—হুজুর। রাগ করবেন না,আপনারা মনে ক'রলে কি না করিতে পারেন।

"তাই জেনে রেখো আমার প্রাণের সখা। তাই জেনে রেখো। আমাদের হাতে বল না থাকিলেও আমাদের প্রাণে অনেক বল" বলিতে বলিতে সন্ধ্যা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

হৃষীকেশ বলিলেন,—পালিও না, বীরের উহা ধর্ম্ম নহে।

"অনেকক্ষণ লড়াই হইল,এখন কিছু রসদ চাই। বেলা অনেক হইয়াছে যাও তোমারও ছুটি। তোমার সর্দ্দার এখন তোমাদের রসদের যোগাড়ে ছুটিলেন," বলিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে সন্ধ্যা প্রস্থান করিল।

হৃষীকেশ ও বেলা অনেক হইয়াছে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দরবারে।

সুলতান সুলেমান সিংহাসনে, বামপার্শ্বে বন্ধু খানজাহান, দক্ষিণে কালাপাহাড—রাজু। রাজু আজ সুলেমানের দক্ষিণ হস্ত। আজ বড় আনন্দ। রাজু আজ সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইতেছেন। ভারি জাঁক, বড় উৎসব, নগরময় আনন্দ। তুমি হিন্দু, তোমার অনেক সম্মানের দেবতা, আজ আমার হাতে তাহা বিনষ্ট হইবে, ইহাতে আমার আজ বড় আনন্দ। আমার হুকুম, তুমি আসিয়া আমার এ আনন্দে যোগ দেও। নবাবের অনুমতি, রাজ্যের যত প্রধান প্রধান লোক আজ এ দরবারে উপস্থিত হইবে। রাজুকে আজ সেনাপতিপদে বরণ করিব, আমার এ সমারোহে তোমরা কায়মনোবাক্যে সাহায্য করিবে। কাহার সাধ্য সুলতানের হুকুম অমান্য করে, তাই দেশের প্রায় সকলেই সমবেত। দরবারগৃহ লোকে লোকারণ্য। সকলেই উদ্‌গ্রীব। সুলতানের কৃপাকটাক্ষ পাইতে আজ সকলেই লালায়িত। শব্দ মাত্রে নাই, সকলেই নিস্তব্ধ। একটু জোরে নিশ্বাস বহিলে সে সভাগৃহ বুঝি চমকিত হইয়া উঠে তাই নিশ্বাসও বুঝি বহে না। এত যে সভাসদ্ কাহারও একটু সাড়াশব্দ নাই, সকলেই নিস্পন্দ। কেহ আনন্দে

'বিভোর নড়িবার, অবকাশ নাই, কেহ বিষাদে নিমগ্ন নড়িবার সামর্থ্য নাই।

মঞ্চের উপরে সিংহাসনে বসিয়া সুলতান সুলেমান দেখিলেন,—"ভয় নাই। চারিদিক হইতে আসিয়া আকাশে মেঘ সব জমায়েত হইয়াছে, এখন বাতাস উঠিলেই হয়। ঐ অত যে উন্নত শির এখনি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। শুধু হুকুমের অপেক্ষা, এই দিই আর কি।" সুলতানের চক্ষু উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আর রাজু দেখিল,—এ যা হইয়াছে, ঠিক হইয়াছে, ইহার জন্য ভাবনা কি? এখন একবার এখান হইতে উঠিতে পারিলে হয়, দেখি সে রূপসাগরে কত রত্ন। হিন্দুর আছে কি, যে তাহাদের ঠাকুরকে ভয় করিব? আমি যাহার জন্য আমার সব ছাড়িতে পারিয়াছি, তাহার কাছে জগন্নাথ কি? আমি খানজামানের কথা রাখিব, সুলতানের হুকুম মানিব। মকুন্দদেব কোন্ ছার, তাহাকে ভয় করি না। যার আর জগন্নাথের ভস্ম সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিব। লড়াই'র জন্য ভাবনা কি? দরবার ভাঙ্গিলে হয়! আহা কি রূপ! আমি তাহা পাইয়াছি আমার কি সৌভাগ্য!!! গাছ পাথরের দেবতা পূজিয়া আমার কি হইত, বেশ করিয়াছি। এখন দরবার ভাঙ্গিলে হয়। রাজু সোৎকণ্ঠে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। আর খানজামান ভাবিল,—পুত্রীর মঙ্গল হউক। কামিনীর জন্যই রাজু আজ আমার জামাতা। একবার উড়িষ্যা জয় হইলে হয়। খানজামান বন্ধু সুলেমানের দিকে সতৃষ্ণে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। সুলতান বলিলেন,—মিত্রবর! আপনার জামাতার হস্তেই পাঠানের বিজয়লক্ষ্মী। আপনি আমার পরম বন্ধু। খানজামান বলিল,—সুলতানের অনুগ্রহ।

তখন সুলতানের ইঙ্গিতমাত্রে, দেওয়ান সাহেব দূর হইতে কুর্ণিশ করিতে করিতে সুলতানের নিকটে আসিলেন, এবং একে একে সমাগত সভ্যমণ্ডলীর পরিচয় ও সাহায্যদানের বিবরণ বিবৃত করিলেন।

দেওযান চুপ করিলে সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন আমার বাজ্যেব যাবদীয প্রধান প্রধান ব্যক্তিরাই আসিযাছেন তো ?

দেওয়ান যোড়হাত কবিয়া বলিলেন,—খোদাবন্দ। সকলেই হাজির। কেবল দেখ্‌ছি রামচন্দ্রপুবেব জমীদাব জগৎ রায় গরহাজীব। এখন সে বদ্‌মাযেসেব উপব কি হুকুম হয ?

সুলতানেব চক্ষু জ্বলিযা উঠিল, বলিলেন,—এত বড আস্পর্দ্ধা ! দেওযান সাহেব ! নেক্‌নজর কবিও না। আমাব হুকুম, নিমকহারামেব বাডী ঘেরাও কবাও, হাপসী দিযা তাহাব ইজ্জত খাওযাইয়া হারামজাদকে হাজিব কব।

সভাশুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হইযা গেল। দেওযান "যে আজ্ঞা" বলিযা কুর্ণিশ কবিতে কবিতে চলিযা গেল।

দববাব ভাঙ্গিযা গেল। বাজু হাঁপ ছাডিযা বাচিল।
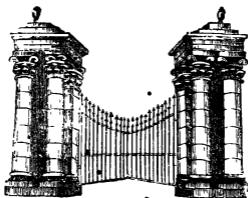
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তুমি কে ?

সকল ইন্দ্রিযের পথ বোধ করিযা আমার এ অবকাশশূন্য অন্তবে সুপ্রতিষ্ঠিত হে আমাব তুমি। তুমি কে ? আমার এ মেঘডম্বরে চামেলি তুমি যদি বিদ্যুৎ না হইতে আমার গতি কি হইত ? আমি আমাব এ অন্ধকারময় জীবনে যদি তোমায না দেখিতে পাইতাম তবে আমার উপায় কি হইত ? দরবার গৃহ হইতে চামেলীর গৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে বাজু ভাবিল,—হিন্দু থাকিবা—ইহকালে জলাঞ্জলি দিয়া—কেবল পরকালের কল্পিতসুখে আত্মসমর্পন করিযা—আমার কি হইত ? কাহারই বা কি হয় ? সম্মুখে নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বিনী, তুমি তাহার জল পান করিয়া মর্ত্ত্যে স্বর্গসুখ অনুভব কব। হিন্দু বলিবে তাহা কবিও না। তুমি পিপাসায মরিয়া যাও তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তুমি বুঝিযা রাখিও, তোমাব ও পিপাসা পিপাসাই নহে। আর ঐ যে তোমার চক্ষেব সম্মুখে কলনাদিনী প্রবাহিণী ঐ অমন মধুর তানে বঙ্কিম গতিতে চলি যা যাইতেছে, তুমি উহাব পানে চাহিও না। ভাবিও উহা কিছুই নহে। তুমি চক্ষু বুজিযা ঐ ঘোর অন্ধকারে আলোকেব অনুসন্ধান কব, সেখানে তোমার জন্য সুখের বাগাব পাতান বহিয়াছে। তুমি সেইখানে যাইবাব চেষ্টা কব। কি মূর্খতা! এই মূর্খতাই হিন্দুর পরম জ্ঞান!!!

আর এই সেই জ্ঞানের মক্‌স করিতে হইলে আগে, নাকি পৌরাণিক হইতে হয়। গাছ পাথর পূজা করিতে হয়। কি মোহ। আল্লা হো আকবর। এ জাতির উপর কৃপাকটাক্ষ করিও। তোমার শপথ, ইহ'দের উদ্ধারের জন্যই আমি অস্ত্র ধরিয়াছি। ইহাদের দেবতা তাঙ্গিব। মূর্খেরা দেখুক, তাহাদের গাছপাথর, গাছপাথর ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাবিতে ভাবিতে রাজু পুলকিত হইয়া উঠিল। একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, ভাবিল,—কই আমার সে কই? কই এখনও ত' আমার সে নিদাঘের বারিবাহ—হৃদয়ের সুখচিন্তা—ভবিষ্যতের বর্ত্তমান—প্রীতির প্রতিবিম্ব—চামেলীর সম্মুখে আসিতে পারি নাই? রাজু মনে মনে বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তখন চীৎকার করিয়া বাহকদিগকে বলিল, "জলদি কর"। বাহকেরা তাড়াতাড়িই চলিতেছিল, তবু ধমক খাইয়া আর ও কিছু তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। রাজু ভাবিতে লাগিল,—এ সকল মুহূর্ত্তে যবনিকা পড়িল না কেন?

রাজু চক্ষু মুদিয়া সময় কাটাইতেছিলেন। চক্ষু চাহিয়াই দেখিলেন বাহকেরা একেবারে খানজামানের কন্যান্তঃপুরের দ্বারে আসিয়া তানজাম নামাইয়াছে। রাজু আশু বাড়াইয়া ছিলেন। তৎক্ষণাৎ তানজাম হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। খোজারা সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, বাদীরা আগে আগে চলিল, রাজু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তারপর ও কি!!! রাজু বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল তাহার সেই "চ্যুতা দিব স্থাস্নু বিবাচিরপ্রভা" বিধাতার নূতন সৃষ্টি। ভাবিল এ বিদ্যুৎ আমারই। রাজুর সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা তাড়িৎ বহিয়া গেল।

• তারপর একবার ভাবিয়া দেখ, ঐ যে বসন্তের বাতাস, যাহার একটু আভাস পাইয়া তুমি কি যেন কি হইয়া গিয়াছ, তাহার ঐ যে অত দৌড়, তাহার দিকে একবার লক্ষ্য কর, দেখিবে তাহারও একটা কিছু

হইয়াছে, নহিলে সে অত আন্‌চান্ করিবে কেন? তাহারও বুঝি কেহ আছে, নহিলে সে মলয় পর্ব্বত ত্যাগ করিবে কেন? রাজু ভাবিল,—হিন্দুর পরকালের কল্পনায় বজ্রাঘাত হউক, আমার ইহকালের সৌভাগ্য দেখিয়া যাও। ঐ মলয় পর্ব্বতের বাতাস শুধু আমারই জন্য পর্ব্বত ত্যাগ করিয়াছে। সংসারে আমার মত সুখী কে? রাজু দেখিল,—তাহার চামেলী তাহাকে দেখিয়া আসন হইতে উঠিতে চাহিতেছে। তাড়াতাড়ি গিয়া রাজু বলিল,—চামেলি! উঠিতে হইবে না, খোদার রাজ্যে অবিচার নাই, চাঁদ উঠে, আর জলে থাকিয়াই কুমুদিনী হাঁসে, চাঁদের উহাতেই তৃপ্তি, দুনিয়ার ইহাই দস্তুর। রাজু গৃহে প্রবেশ করিলে বাঁদীরা সব সরিয়া গেল। চামেলী বসিয়াছিল উঠিয়া দাড়াইল, বলিল সে অনেক কথার কথা, ও কথা এখন থাক্। এখন এ কি? এ বেশ কেন? এ যুদ্ধের বেশ কিসের জন্য?

রাজু বলিল,—চামেলি! তোমার পিতার ইচ্ছা, সুলতানের হুকুম, আর ইহাতেই বা ভয় কি? সামান্য কথা, আমায় উড়িষ্যাজয়ে যাইতে হইবে।

চামেলী বলিল,—বুঝিলাম। কিন্তু সুলতান বোধ হয় জানেন মুকুন্দদেব কেমন বীর। নিশ্চয় বাদসাহ আকবর তাঁহার পরম বন্ধু।

রাজু বলিল,—সুলতানের কিছুই অবিদিত নাই, তবে আমি—

চামেলী বাধা দিয়া বলিল,—তবে যাহা তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করিতে দোষ কি? মনে মনে বলিল, সুলতানের বা তাহাতে ইষ্টানিষ্ট কি?

রাজু হাঁসিল। বলিল,—আমার সর্ব্বস্ব! ইহাতে আর ভাবনার কিছুই নাই। তা যাক্, ও সব কথায় কাজ নাই, বলিয়া রাজু তাঁহার দক্ষিণ হস্ত চামেলীর বামস্কন্ধে স্থাপিত করিয়া বলিল,—চামেলি! এখন

ব'স' তোমায় দেখিতে আসিয়াছি, খানিক দেখি, তাহার পর প্রসন্ন মনে বিদায় দেও। আবার শীঘ্রই আসিয়া এমনি করিয়া দেখিব। বলিয়া দুজনেই সেই পাদাস্তিবস্ত কোচের উপব উপবেশন করিল।

তখন জামার জেব হইতে বাজ্ একখানি চিত্রপট বাহির কবিয়া বলিল,—চামেলি। দেখ এ কেমন তসবিব? এমন রূপ কখন দেখিযাছ কি?

চামেলী দেখিল,—স্ত্রী মূর্ত্তি, ভাবিল এত রূপ। আবার দেখিল তখন অধরের কোণে একটু হাঁসি দেখা দিল, বলিল,—ঠিক্ হয নাই, এ শুধু বঙ্। বলিয়া তসবীব খানি রাখিয়া দিল।

বাজ্ ও হাঁসিল, বলিল,—তা বটে, কিন্তু তা বলিযা ফেলিয়া রাখিও না। মিলাইয়া দেখ বঙে বঙ্ মিলে কি না একবাব দেখিল লও? বুঝিতে পারিবে পৃথিবীতে এ বঙেব সাদৃশ্য নাই।

চামেলী মনে মনে বড আনন্দিত হইল। কে না হয়? সুবে সুব মিলিলে কাহাব না প্রাণে বাজে? প্রাণ প্রাণ মিশিলে কে না আপনাহারা হয? চামেলী ভাবিল,—এইত' জানি, এমনি করিয়া একসঙ্গ একতাবে ঝঙ্কার দিব ইহাইত' চিব আকাঙ্ক্ষিত। যখন আশাব তাড়নায ছটফট্ করিতাম তখন ত' শুধু ইহাই পাইবাব জন্য লালায়িত ছিলাম, তা ত' পাইয়াছি, অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে, অনেক কৌশলে, তাহা পাইযাছি। হিন্দু মুসলমান হইবে না, ইহা ত' আমাব দুবাশাই ছিল। তাহাব পর দুনিযাওযালাব মর্জ্জি হইল, হিন্দু মুসলমান হইল, আমার আশা মিটিল। তাহাব পব এ কি। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতমা, আমার আশালতায বাঙ্গালার নবাবের লোল দৃষ্টি কেন? আমার এ লতার বিনিময়ে তুমি নবাব, তুমি হয তো উড়িষ্যার সাম্রাজ্য পাইবে, তোমার ভরি আনন্দ। আব আমার কি হইবে?

আমি যে লতার শীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিব বলিয়া মনে করিয়াছি, আমার তাহা না থাকিলে, তুমি উড়িষ্যাবিজয়ী নবাব! আমার সে নিদাঘের আতপতাপের উপায় কি করিবে? একবার ত' ভাবিবেও না, পথের ঐ বালুকাকণা জ্বলিয়া পুড়িয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! চামেলী চক্ষু বুজিয়া দেখিল,—তাহার সেই স্তবকে স্তবকে কুসুমের সারি দেখাইয়া ঐ নীলজীমূতসঙ্কাশ শীতল স্নিগ্ধ লতামণ্ডপটী নাই, যাহার অভ্যন্তরে বসিয়া চামেলী সবই শীতল দেখিত। সেখানে বায়ু শীতল, বায়ুর শীতল চালনে পুষ্পস্তবকের দোলনও শীতল, আর শীতল প্রসারী ঈষৎ বঙ্কিমগ্রীব নবনব লতার অগ্রভাগগুলির কম্পনও কেমন সুশীতল। চামেলী দেখিল,—আমার এমন লতামণ্ডপটী নাই। যেখানে ধীরে বায়ু বহিত, সেখানে খরস্রোতে বাতাস উড়িতেছে। চারিদিক্ হাঁ হাঁ করিতেছে। স্নিগ্ধতার নাম গন্ধ নাই। কি কঠোর দর্শন! চামেলীর মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তখন চমকিত হইয়া চামেলী জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি এ তসবীর বরিয়াছ কেন?

রাজু বলিল,—সঙ্গে লইয়া যাইব বলিয়া।

চামেলীর সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়া আর একবার বসন্তের হাওয়া বহিয়া গেল। বলিল,—নকলে কাজ কি? আসলই প্রস্তুত।

রাজু চামেলীর হাতখানি ধরিয়া সাদরে একবার নাড়িয়া দিল। বলিল,—এই জন্যই এত, চামেলি! সর্ব্বস্ব দিয়াছি, এখন ভিক্ষা করি একবার বিদায় দেও।

চামেলী বুঝিল যুদ্ধক্ষেত্র স্ত্রীলোকের অগম্য। ভাবিল মানুষ চিরদিনই পরাধীন। পিতার অপরাধ নাই। তিনি আশার দাসত' বটেনই তাহার উপর আবার সুলতানের রাজ্যে থাকেন, সুতরাং এ বেগ অদম্য। আমি স্ত্রীলোক, লোকে তাহা জানে, আর তাহা জানাইয়া কি

হইবে? কেবল হাঁসিবে বৈ ত' নয়? থাক্‌, শূন্যেই বাস করিব, দেখি, পারি কি হারি।

দূরে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। রাজু ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বলিল,—চামেলি! ঐ শুন, সুলতানের হুকুম, মাথা থাকিবে না, এখনি যাইতে হইবে। বলিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল।

চামেলীও দাঁড়াইল। বলিল,—রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না, যাও।

চামেলী সরিয়া দাঁড়াইল। রাজু দ্রুতপদে চলিয়া গেল। চামেলী দেখিতে লাগিল বাহির হইতে লতাগৃহের সৌন্দর্য্য কেমন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ।

জগৎ রায় জানিতে পারিয়াছেন তাঁহার আর রক্ষা নাই। তিনি সুলতানের দরবারে উপস্থিত হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি জানিতেন ইহার ফলে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। তাই তাহার ফল জানিবার জন্য দরবারে এক গুপ্তচর পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মুখে সুলতানের হুকুম শুনিয়াছেন। ভাবিতেছেন,—এখন উপায় কি? বাঙ্গালার নবাবের বলের কাছে, জমীদারের লাঠীয়ালের বল অতি তুচ্ছ, সুতরাং সে পথ অবরুদ্ধ। তাহার পর অপরাধ স্বীকার করিয়া শরণাগত হওয়া, জগৎ রায় ভাবিলেন,—তাহাও অতি তুচ্ছ। তবে এখন উপায় কি?

গ্রামের আর কেহ এ আতঙ্কের কথা এখনও শুনে নাই। শুনিয়াছে শুধু হৃষীকেশ, আর জগদীশ্বর রায়। জমীদার জগৎ রায়ের সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ঠতাটা কিছু বেশী। জগৎ রায় তেজস্বী। তিনি প্রাণের বলে বলীয়ান্, ঔদার্য্যে উন্নতমনাঃ, সুতরাং সীমাবদ্ধ বিষয়সুখে তিনি অবিজড়িত। তাই যেখানে ঔদার্য্য দেখিতেন, সেখানেই আত্মোন্নতি আছে বলিয়া মনে করিতেন, সেখানে আপনি গিয়া স্রোতে স্রোত মিশাইতেন, অপর কিছুর তারতম্য,একটা তারতম্যই বলিয়া মনে করিতেন না। জগৎ

বায়ের আকাজ্ঞিতৌদার্য্য হৃদয, হৃষীকেশকে আকাঙ্ক্ষা করিল, জগদী-শ্বরকে মান্য করিল, প্রেমেতে ভক্তিতে মিশিয়া গেল। জগদীশ্বরে ভক্তি, হৃষীকেশে প্রেম দিয়া জগৎ বায় বড় আপ্যায়িত হইলেন। তাহার পর কেহ জানিতে পারিল না—সকলেব ত' জানিবাব অধিকারও নাই, শুধু তিন জনেই জানিল—এ বেশ হইয়া গেল।

আজ তিন জনে এক নিভৃতকক্ষে একত্রে সমবেত। তিন জনেই চিন্তাকুল। কক্ষ নিস্তব্ধ। জগদীশ্বর বলিলেন,—ভাবিয়া দেখিলাম আব অন্য কোন উপায নাই, এখন উপায শুধু দেশত্যাগ। হৃষীকেশ তোমাব মত কি ?

হৃষীকেশ বলিলেন—তাহা ছাড়া ত' উপায নাই, কিন্তু যাওযা যবে কোথায ?

জগৎ রায বলিলেন,—সর্ব্বস্ব ছাডিয়া শুধু ইজ্জত বাচাইতে দেশ ত্যাগ করিতে হইবে সত্য, কিন্তু তাহাতেও যেন কর্ত্তব্য কর্ম্মেব ত্রুটি না হয এমনটী চাই। তাহার ভিতবেও যেন প্রতীকারেব চেষ্টা থাকে এমন দেশত্যাগ কবিতে হইবে।

কথাটা ঠিক্। হৃষীকেশ বলিলেন,—কথাটা ঠিক্। কিন্তু পাঠানকে দণ্ড দেয এদেশে এখন আব এমন কে আছে ? যশোরে প্রতাপাদিত্য উঠিতে যাইতেছেন মাত্র, সুতবাং তাঁহাকে এখন বিব্রত করা উচিত নয়, তিনি এখন ক্রমে ক্রমে নিঃশব্দে উঠিতে থাকুন্, ভবিষ্যতে আমা-দেরই মঙ্গল হইবে। সুতবাং এখন পাঠান শাসন কবিতে এক বাদ-শাহ আকবর ভিন্ন আর কাহারও ক্ষমতা নাই। যদি তাহাই করিতে হয়—যদি প্রতীকারের উপায দেখিতে হয—তবে আকবরের নিকট যাইতে হয়। আকবর মুসলমান হইলেও বড নাকি হিন্দুপ্রিয়, রাজা মানসিংহ রাজা টোডরমল্ল প্রভৃতি বড় বড় হিন্দুরাজা আকবরের প্রীতির পাত্র, সুতরাং পাঠান নবাব কর্ত্তৃক হিন্দুর অবমাননাব কথা

শুনিয়া আকবর প্রতীকার করিলেও করিতে পারেন। বিশেষ আকবর এখন তাঁহার বন্ধু উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেবের সাহায্যার্থ অবশ্যই একটা না একটা উপায় করিতেছেন, সুতরাং আকবরেরও এই সূত্রে একটা সুযোগ হইবে, তিনি বাঙ্গালারাজ্য আপনার অধীন করিয়া লইতে পারিবেন। আর মনে হইতেছে আমাদের মুখে সুলেমানের অত্যাচারের কথা শুনিয়া আকবরের ও কিছু কার্য্য হইবার সম্ভাবনা, অতএব এ ক্ষেত্রে নীতি অনুসারে আকবর অবশ্যই আমাদের কথা শুনিবেন।

জগদীশ্বর বলিলেন,—উত্তম পরামর্শ। তবে তাহাই হউক, দিল্লী অভিমুখেই যাত্রা করা যাউক্।

জগৎ রায় পুলকিত হইলেন। বলিলেন,—বেশ কথা, তাই হউক, কিন্তু গ্রামের লোকের উপায় কি হইবে?

হৃষীকেশ বলিলেন,—গ্রামে রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া হউক "জগৎরায় প্রচুর অর্থ লইয়া সুলতানের শরণাগত হইতে চলিলেন।" সুলতানের লোক উপস্থিত হইলেই সকলে একবাক্যে এই কথা বলিতে পারিবে, তাহা হইলে সম্পূর্ণ না হউক, উপদ্রবের মাত্রা কিছু না কিছু কমিয়া যাইতে পারিবে।

জগৎরায় বলিলেন,—যা হ'ক এক রকম হ'তে পারে বটে। আর ত' উপায় ও নাই, তাহাই করিতে হইবে।

তখন স্থির হইল এ দেশ ছাড়িয়া, এ সুখ সম্পত্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া জগৎ রায়কে চলিয়া যাইতে হইবে। এ পরামর্শটী স্থির হইয়া যাইবার পর তিন জনেই আবার নিস্তব্ধ হইলেন। নিস্তব্ধ হইবারই কথা। কেন না ব্যাপারটী ত' বড় কম নহে, দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া, গ্রামের যিনি প্রাণ তাঁহার চলিয়া যাওয়া। আশা যাহাই থাকুক, কিন্তু দেখিতে গেলে ত' এ যাওয়া একেবারে যাওয়া,

চিরদিনের জন্য যাওয়া। ভাবিয়া দেখিলে কথাটায় চমকিত হইতে হয়। কিন্তু উপায় ও ত' নাই। তাই সকলেই নিস্তব্ধভাবে চিন্তাকুল।

জগৎ ভাবিলেন,—আমি ত' চলিলাম, সংসারে আমার আর কেহই নাই, এক স্ত্রী, তাঁহাকে ত' সঙ্গে করিয়াই লইয়া যাইতে হইবে। আশা অনন্ত, কিন্তু পথেরও ত' ইয়ত্তা নাই, তাহার উপর আবার অদৃষ্টও ত' এই, সম্মুখে কত যে বিপদ্ কে তাহার গণনা করিবে? আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে আমি কি করিতে কি করিতেছি? আমার কি হইতে কি হইবে? জগৎ রায় চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

আর হৃষীকেশ, হৃষীকেশ ভাবিলেন,—জগৎ রায় কি একাকী যাইবে? কেন? জগৎ রায়ের অপরাধ কি যে সে এই সমস্ত সুখসম্পত্তি বন্ধু বান্ধব ছাড়িয়া ইহজীবনের জন্য দেশ ত্যাগ করিবে? তাহার অপরাধ সে মুসলমানের কথা শুনে নাই, মুসলমানের কথা শুনিয়া হিন্দুর দেবতানাশে সহায়তা করিতে চাহে নাই। দেবতা তাহার নহে, হিন্দুর, কোন্ হিন্দু তাহার এ নির্ম্মল বক্ষে দেবভাব প্রতিবিম্ব না দেখিতে পাইবে? সে যে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া হৃদয় যুড়িয়া শুধু দেবতাকেই রক্ষা করিতেছে, তুমি হিন্দু হইয়া তোমার সেই দেবতাস্থান দেখিবে না? রাখিবার জন্য প্রাণপাত করিবে না? হৃষীকেশ ভাবিলেন,—তুমি কর আর নাই কর, আমি করিব। আমি জগৎ রায়ের সঙ্গে যাইব। হৃষীকেশ স্থিরদৃষ্টে জগৎ রায়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

উভয়েই নিস্তব্ধ। জগদীশ্বর ভাবিলেন,—তাইত? এ কি হইতে চলিল? বাতাস উঠিতে উঠিতে ঝড় উঠিয়া পড়িল? নদী বেশ বহিয়া যাইতেছিল, কেমন মৃদুস্রোতা, কেমন নির্ম্মলসলিলা, কেমন তটশালিনী। হঠাৎ ঐ তীরভূমির এক কোণ খসিয়া পড়িল, তাহার পর হইতেই এ কি হইয়া পড়িল? সে সুন্দর তটভূমি আর রহিল না,

সে নির্ম্মল সলিল রহিল না, যে স্রোত হইল তাহার দিকে চাহিতেও যেন প্রাণ শুকাইয়া উঠে। এ গ্রামেরও দেখ্‌ছি ক্রমে তাহাই হইল। গ্রামখানি কেমন ছিল, গ্রামে সব ছিল, যাহা থাকিবার সে সমস্তই ছিল, আমরা কেমন সুখে ছিলাম। তাহার পর এ কি পরিবর্ত্তন। ঘূর্ণ্যমান চক্রের সম্মুখে আসিয়া আমাদের গ্রামখানি দাঁড়াইল, সে বেগের প্রবল বাত্যায় আহত হইয়া প্রথমেই সুধীর খসিয়া পড়িল। সেই খসাই খসা, কেমন যে ইহার গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িল আর জোর করিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। ক্রমেই এক একটী করিয়া সব খসিতে লাগিল। বলদেব আচার্য্য খসিয়া গেলেন, গ্রামের পাঁজর ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর এই জগৎ রায় ও ত' যাইতে বসিয়াছেন, এবার ত' গ্রামের বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে!

কি সর্ব্বনাশ!!! এ মরা গ্রামে কেমন করিয়া থাকিব? জগদীশ্বর চক্ষু বুঝিলেন, ভাবিলেন,—তাহা হইবে না, সেই যাইতে হইবে তবে জগৎকে ছাড়ি কেন? আমিও জগতের সঙ্গে এ গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইব।

তখন তিন জনেই স্থির করিলেন এ গ্রাম ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। সকলেই সকলের কথা শুনিয়া বড় আনন্দিত হইলেন, সকলেই ভাবিলেন দেবতা মুখ তুলিয়া চাউন্, আমরা বেশ চলিলাম।

তখন স্থির হইল আজি রাত্রি দ্বিতীয়প্রহরের সময় গুপ্তবেশে এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে, বিলম্ব করিলে অনর্থের সম্ভাবনা।

সকলেই উঠিলেন। জগৎ রায় বাড়ীর ভিতর যাইলেন। হৃষীকেশ সন্ধ্যার বীরপণার খবর লইতে আসিলেন। জগদীশ্বর উষার জন্য কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন, কিন্তু সন্ধ্যার কথা মনে পড়ায় আশ্বস্ত হইলেন, ভাবিলেন,—সঙ্গে যখন সন্ধ্যা থাকিবে তখন উষার জন্য ভাবনা কি?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নিশ্বাস বহিল।

উষা যখন সন্ধ্যার কাছে শুনিল, যে জগৎ রায়ের সঙ্গে এই আমরাও কজন এ দেশ ত্যাগ করিব, তখন বুকের ভিতর এই যে এত দিনের গুরুভার, তাহা যেন সরিয়া পড়িল, আর উষা আরাম পাইয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

সুধীর চলিয়া যাওয়া অবধি উষা ভাবিয়া আসিতেছে, আমার কি হইবে? আমার সব রহিয়াছে, কেবল সে নাই। বাড়ী বল, ঘর বল, বাপ বল, মা বল, আমি বল, সেই সব রহিয়াছে, কিন্তু যেন কিছুই নাই। দেহ সবই রহিয়াছে কিন্তু তাহাতে প্রাণ নাই, তাহাত' দেখিতে পারা যায় না। এত যে আদরের শরীর, সে ত' ঐ পড়িয়া রহিয়াছে, কই তাহার দিকে যে নয়ন ফিরাইতে পারিনা, বুক যে ভাঙ্গিয়া যায়, কেমন করিয়া দেখিব? হে আমার তুমি! তোমার ও দশা যে দেখিতে পারিনা। আমি যেন তোমায় বুকের ভিতর খোদিত করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারি, জগদীশ। এখন আমার এমন দিন কব, আমি এ দৃশ্য আর দেখিতে পারিনা।

উষা ভাবিয়া আসিতেছে,—এ গৃহ আমার কণ্টক। এখানে সুধীর বসিত, এইখানে আসিয়া সুধীর দাঁড়াইয়া থাকিত, এই জিনিষটী সুধীর

ছুঁইয়াছিল, এইটির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াছিল, আমি এ সব দেখিয়া কেমন সুখী হইতাম, এ সব যেন আমার প্রাণ, এ সবে যে তখন প্রাণ ছিল। এখন আমার এ সব যে কণ্টক, দেখিতে পারি না, সর্ব্বাঙ্গ যেন সূচিবিদ্ধ হইয়া উঠে। "এখন সুধীর গিয়াছে, এখন আমি যে দিকে চাই, দেখি সবই যেন মৃতদেহের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে, আমি এ প্রাণশূন্য দেহ আর দেখিতে পারি না, আমি ইহা চাহিনা। আমি সে প্রাণের স্মৃতি হৃদয়ে গাঁথিয়া ইহাকে ত্যাগ করিতে পাইব, ভগবন্! আমার এমন দিন কবে আসিবে?

আজ উষার সে দিন আসিয়াছে, তাই আজ উষা প্রাণের সে বিষম বোঝা নামাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। উষা গৃহত্যাগের কথা শুনিয়া বড় সুখী হইল!

সন্ধ্যা ইহা জানিত—জানিত যে এ পিঞ্জরে দুইটী পাখী ছিল, একটী উড়িয়া গিয়াছে, আর একটী এখন আর সেখানে একাকী থাকিতে পারেনা, প্রাণ ছট্‌ফট্ করে। উষা এখন এ গৃহ ত্যাগ করিতে পারিলেই বাঁচে। তবে উষার পিতা মাতার অনুরোধে সন্ধ্যা উষাকে বুঝাইতে আসিয়াছে। বুঝাইতে আসিয়াছে—যে এই এই কারণে আমাদের এ দেশ ত্যাগ করিতে হইবে, তোমার দুধের শরীর, বড়ই কষ্ট হইবে, কিন্তু কি করিব মা! বিধির বিপাক। সন্ধ্যা আসিয়া তাহাই বলিল, উষা বুঝিল, সন্ধ্যাও তাহা বুঝিতে পারিল।

তখন উষা বলিল,—দিদি! এত দিনের পর বিধাতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন; এইবার এ গৃহবাসপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

সন্ধ্যা বলিল,—আশীর্ব্বাদ করি এ প্রায়শ্চিত্তের যেন সীমা থাকে।

'এক সঙ্গেই ত' থাকিব' বলিয়া উষা সন্ধ্যার পদধূলি গ্রহণ করিয়া মা'র কাছে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যা উষাকে ভাবিয়া ব্যথিত অন্তরে বাড়ী আসিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।

আমি কি করিতেছি? বিরিঞ্চির এ বিপুল রাজ্যে বাস করিয়া দেখিতেছি শুধু অন্ধকার? জ্যোতির্ময় বলিয়া শুধু অন্ধকারের সম্মুখীন হইতে যাইতেছি? জ্ঞানময় বলিয়া ঘোর অজ্ঞানের অর্চ্চনা করিতেছি? ঐ যে আনন—মেঘমুক্ত শরদাকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় ঐ যে মধুরোজ্জ্বল মুখমণ্ডল—দেখিলাম—হাঁসিতেছে, যেন আমার উপর অমৃতের ধারা বর্ষণ করিতেছে, আমার প্রাণ উধাও হইয়া তাহার পানে ছুটিয়া যাইতে চাহিল। আমি মূর্খ, আমি নয়ন ফিরাইলাম, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রাণকে বাঁধিতে লাগিলাম, প্রাণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, আমি বুকে পাষাণ বাঁধিয়া পাগলের মত সে দেশ ত্যাগ করিলাম, ভাবিলাম বুঝি শাস্ত্রের কথা রক্ষা করিলাম, নৈষ্কর্ম্মের বুঝি পূজা করিলাম। ওগো! কি করিতে কি করিলাম! কি বুঝিতে কি বুঝিলাম! ঐ যে নয়ন—লজ্জাজড়িত—বাসনাবিলসিত—নিস্তরঙ্গ—রসের সাগর—উহা যে ভাবিতেও পারি না! আমি কর্ম্মের উপাসনা করিব, নৈষ্কর্ম্ম্য বুঝিতে থাকিব।

এখন আমারসাভ্রেহন্লীব স্থলকমলিনী ন প্রবুদ্ধা ন সুপ্তা তুমি। তুমি কোথায়? আমি এখন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি তুমি তোমার দিবসে মেঘডম্বর দেখিয়া ভয়ে ফুটিতে পার নাই, কিন্তু সে আশা ত' ছাড়িয়া দিবার নয় তুমি কেমন করিয়া ছাড়িবে? তাই মুদিয়াও থাকিতে পার নাই। আমি অভাগা, আমি সে আশা—সে নৈরাশ্য, সে স্মৃতি—সে দর্শন, সে আলোক—সে অন্ধকার, সে নিদ্রা—সে প্রবোধ, কে মোহ—সে জ্ঞান, দেখিয়াও দেখি নাই, বুঝিয়াও বুঝি নাই, বুঝি নাই—যে ফুলে সৌগন্ধ্য কেন? সৌগন্ধ্যে মাধুর্য্য কেন? মাধুর্য্যে মোহ কেন? মোহগ্রস্ত হইয়াছিলাম, ভয় পাইয়াছিলাম, পাছে হারাই বলিয়া, নৈরাশ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। চন্দ্র দেখিতে গিয়া সুধার ধারা গণিতে গিয়াছিলাম, সমুদ্র দেখিতে গিয়া তাহার জল মাপিতে গিয়াছিলাম, আমার সুখ হইবে কেন? আমার আশা মিটিবে কেন? আমার কান্না থামিবে কেন? আমি ঘোর পাপী। ঐ—রূপে দিক্ আলো করিয়া—সৌগন্ধ্যে বায়ুর নবজীবন প্রদান করিয়া—ঐ যে ফুটন্ত ফুলটী—আপনা আপনি শোভা পাইতেছে, আমি উহার পানে চাহিলামনা। আমার গুভাদৃষ্ট। তাই উহার সৌগন্ধ্য মাখিয়া ঐ যে বাতাস আমার দিকে আসিতেছিল, আমি মুর্খ, সে অদৃষ্টের দিকে ফিরিয়া চাহিলাম না। আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম! তুমি ফুল! তুমি আমার অপরাধ লইও না। তুমি বিধাতার পুষ্প, তুমি ফুটিতে থাক, হাঁসিতে থাক, হেলিতে থাক, দুলিতে থাক, আমি তোমায় দেখিব। আর তোমায় ছাড়িব না। আবার যদি সে দিন হয়—অতীত যদি বর্ত্তমান হয়—রাত্রি যদি দিন হয়—পৃথিবী যদি স্বর্গ হয়—আবার যদি সে অদৃষ্ট হয়—তবে হে কুসুম! তোমার যাহা সার, তোমার যাহা সর্ব্বস্ব, তোমার যাহা তুমি, তোমার সেই সৌগন্ধ্য ঐ বাতাস আবার আমার দিকে লইয়া আসিবে, আমি প্রাণদান করিব, আমি আত্মবলি দিয়া

সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব, আমায় দেখা দেও। সুধীরের প্রাণের ভিতর বাজিয়া উঠিল "উষা। আমায় দেখা দেও" ?

"গুরুদেব। "রহস্য" বুঝিয়া এ কি হইল ? আমার অদৃষ্টে কি এতই বিষ ?" বৈতরণীর তীরে বসিয়া সুধীর জিজ্ঞাসা করিল গুরুদেব। আমার অদৃষ্টে কি শান্তি নাই ?

সন্ন্যাসী হাসিলেন, বলিলেন, ভয় নাই, জল হইয়াছ, স্রোতে বহিতেছ, আর দেরী নাই, এইবার সমুদ্রে মিশিবে—জলধি হইয়া যাইবে—স্রোত থাকিবে না—শান্তি পাইবে।

সুধীর বুলিল,—তরঙ্গের উপায় কি ?

সন্ন্যাসী বলিলেন,—সমুদ্রের উহা নৃত্য।

সুধীর অধীর হইল,—বলিল সমুদ্র কত দূরে ?

সন্ন্যাসী হাসিলেন, বলিলেন,—সুধীর। দেখ কেমন এই বৈতরণী বহিয়া যাইতেছে।

সুধীর দেখিল,—বৈতরিণী বেশ বহিয়া যাইতেছে। যখন যাইতেছে তখন অবশ্যই কোথাও যাইতেছে, কিন্তু বেশত' ধীরে বহিতেছে, বেশ স্রোতে বহিয়া যাইতেছে, চাঞ্চল্যত' নাই, কেমন অচঞ্চল হইয়া—কেমন নির্ম্মল হইয়া—চলিয়া যাইতেছে। সুধীর বুঝিল, বুঝিল অস্থির হইলে হইবে না। বিধাতা সময় দিবেন এক দিন সমুদ্রে গিয়া মিশিতে পারিব। এখন বহিয়া যাই। কাহারও জন্য ব্যাকুল হইলে চলিবে না। ভাবিতে ভাবিতে সুধীরের চৈতন্য হইল, ভাবিল,—গুরুদেব কি সর্ব্বজ্ঞ !!!

তখন সন্ন্যাসী বলিলেন,—সুধীর ! ঐ দেখ, অপর পারে যাজপুর নগরী। ঐ দেখ ঐ খানে সপ্তমাতৃকার মন্দির দেখা যাইতেছে। ঐ খানেই সপ্তশক্তির অর্চ্চনা হইতেছে। আর প্রধান শক্তি বিরজা মাতা নগরের দক্ষিণপ্রান্তে। চল নদী পার হইয়া নগরের ভিতর যাই,

দেখিবে মুকুন্দদেবের শক্তিপূজা কেমন! সুধীর পশ্চাতে, সন্ন্যাসী অগ্রে অগ্রে পাবঘাটের সন্ধানে চলিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

মা। তুমি সকল মঙ্গলের আলয, তোমায় নমস্কার। সংসারে সবই ত' মঙ্গল মা। মঙ্গলের অভাব কি? তুমি যে সাক্ষাৎ কল্যাণ মা। আমরা হাহাকার করিতেছি, অভিলষিতকে পাইতেছি না বলিয়া চাৎকার করিয়া মরিতেছি, কিন্তু মা। তুমি সর্ব্বার্থসাধিকা তোমায় চিনিতে পারিতেছিনা, জানিতে পারিতেছিনা যে ঐখানে যাইলে আর হাহাকার করিতে হইবেনা। আমাদের দুর্দ্দৈব তাই তোমায় চিনিতে পারিতেছিনা, তোমার শরণাগত হইতেছিনা। ভয় পাইতেছি, পাছে আশ্রয় না পাই বলিয়া অগ্রসর হইতে ভয় পাইতেছি, কেহ বলিয়া দিতেছে না, যে তুমি আর কিছু নহ, কেবল শরণ্যা। তোমার অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গের অণুতে অণুতে শুধুই বাৎসল্য, তুমি সাক্ষাৎ শরণাগতবৎসলা। মা। আর ভয় নাই, তোমায় চিনিতে পারিয়াছি, তুমি কি তাহা জানিতে পারিয়াছি, জানিতে পারিয়াছি—যে তোমার কত শক্তি। তুমি সংসারশক্তি—রজঃ সত্ব তম এই ত্রিগুণের আধার। আধার ভিন্ন আর কি বলিয়াই বা বুঝিব? তুমিই সেই ত্রিশক্তি। অতএব হে ত্র্যম্বকে। হে গৌরি। হে নারায়ণি। তোমায় নমস্কার, আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিও।

বিরজামাতার মন্দিরের অভ্যন্তরে নাভিগয়ার সম্মুখে জানু পাতিয়া গললগ্নীকৃতবাসে গলদশ্রুনয়নে কেন তুমি সন্ন্যাসি। এমন কাতরকণ্ঠে মা মা বলিয়া ডাকিতেছ? সুধীর পশ্চাতে দাঁড়াইযা মাতৃসম্মুখে যোড়হাত কবিযা ভাবিতেছে, মা। তোমার সন্ন্যাসিসন্তানেরও কিসের অভিলাষ মা। আমাব ন্যায় ইঁহারও অন্তরে কি আগুন জ্বলিতেছে? সুধীর সন্ন্যাসীর কান্না দেখিযা মনে মনে বিস্মিত হইল। তখন চাহিয়া দেখিল চারিদিকে লোক জমায়েত হইয়া গিযাছে, সকলেই উৎফুল্লনেত্রে নিস্তব্ধভাবে সন্ন্যাসীকে দেখিতেছে।

খানিক পরে সন্ন্যাসী উঠিলেন, বলিলেন,—সুধীর।দেখ, মায়ের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কর, দেখ, সন্ন্যাসী বলিযা নগরে প্রবেশ কবিতে পাইযাছ, বুঝি এমন দিন আর পাইবে না। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখ, হুহু করিয়া কি ঝড়ই আসিতেছে। কে বলিবে অদৃষ্ট সুপ্রসন্নই থাকিবে? যাহাকে ভালবাসি—যাহা না থাকিলে কি যেন নাই বলিয়া মনে করি—যাহার বিহনে কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা হইয়া পড়ি—কেমন দোষ তাহার অমঙ্গল যেন চারিদিকেই দেখিতে পাই। ভাবি—এ মুহূর্ত্ত বেশ কাটিয়া গেল, আবার মুহূর্ত্ত আসিলে মাথায় আকাশ ভাঙ্গিযা পড়ে, ভাবি—এ মুহূর্ত্ত আবার কেমন করিয়া কাটিবে? তাই বলি, সুধীর। সুযোগ ছাড়িও না, এই সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যা মাকে দেখিয়া লও, আর বল:——

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

তখন চারিদিক্ হইতে সমস্বরে উচ্চারিত হইল,——

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

সন্ন্যাসী আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। লোকে বিস্মিত হইয়া গেল,

ভাবিল,—এ সুধাহৃদয় পৃথিবীর নহে, এ সুধাদ্রব মানুষের নহে, সন্ন্যাসী মনুষ্য নহেন, দেবতা !!! পাণ্ডারা সারি গাঁথিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সন্ন্যাসীকে দেখিয়া মনে করিল,—আর ভয় নাই, মা দয়া করিয়াছেন, আমাদের কান্না শুনিয়াছেন, এই যে এই দেবমূর্ত্তি দেখাইয়া মা আসিয়া আমাদের কান্নায় যোগ দিয়াছেন, "জয় মা সর্ব্বার্থসাধিকে। আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ কর" বলিয়া সকলে সন্ন্যাসীর দিকে সভক্তি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

সুধীর সন্ন্যাসীর ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল, ভাবিল,—কে জানিত জ্ঞান ভক্তির এত আপনার !!! সুধীর কলের পুতুলের ন্যায় সন্ন্যাসীর আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসী বলিলেন,—সুধীর! আইস মাকে প্রণাম করি, আর প্রার্থনা করি মা! তোমায় যেন এমনি করিয়া এইখানে প্রণাম করিতে পাই।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক্ হইতে "জয় মা। জয় মা।" বলিতে বলিতে সারি গাঁথিয়া সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। মন্দিরের সে স্থানটী যেন কি এক ভাবে বিভোর হইয়া পড়িল। অপর যাঁহারা ছিল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। মন্দির শুদ্ধ লোকে সেই দিকেই আসিতে লাগিল। একটা রব হইল—সন্ন্যাসিবেশে দেবতা আসিয়াছেন, আমাদের আর ভয় নাই। বিস্ময়বিজড়িত একটা আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।

প্রণামান্তে সন্ন্যাসী উঠিয়া দেখিলেন,—তাঁহার চারিপার্শ্বে লোক জমিয়া গিয়াছে! দেখিয়া প্রথমে অবশ্য তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন, তাঁহার পর দেখিলেন,—সেই সমবেত লোকে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে, আর তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতা ভাবিয়া এই ঘোরযুদ্ধে যেন সাক্ষাৎ জয়ের মুখ দেখিতে পাইয়া উল্লাসে পুলকিত হইতেছে। তখন তিনি আনন্দে

অধীর হইলেন, ভাবিলেন,—মা ! তোমার দয়ার মাপ নাই, তুমি এই যে আশায় ইহাদিগকে উন্মত্ত করিতেছ, ইহার ফল হৃদয়ের সবলতা, ইহাতেই বিজয়ের সম্ভাবনা। জয় মা ! কে বলিবে তোমার কত শক্তি!! সন্ন্যাসী তখন গদ্‌গদকণ্ঠে সকলকে বলিতে লাগিলেন,—তোমরা মায়ের সুসন্তান, মা তোমাদিগকে কৃপা করিবেন, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

একটা আনন্দের রোল উঠিল। সকলে যেন স্বচক্ষে আশার শেষ স্থান দেখিতে পাইল। হাতের ভিতর যেন দৈববল পাইয়া তাহারা মুসলমানশত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে লাগিল।

তখন জয় মা ! শক্তিরূপিণি ! বলিয়া ক্রমে সকলে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিলে, মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা দামোদর, সন্ন্যাসীর নিকটে আসিয়া করযোড়ে বলিলেন,—ঠাকুর ! যখন দয়া করিয়াছেন তখন ত্যাগ করিবেন না, আসুন আমার গৃহে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করুন।

তাহাই হইল। সন্ন্যাসী দামোদরের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। দামোদর পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন পশ্চাতে সন্ন্যাসী ও সুধীর। দামোদরের বাড়ী মন্দিরের একটু দূরে। ক্রমে মন্দিরের সীমা ছাড়াইয়া তিন জনে বাহিরে আসিলেন। সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা পথ হাঁটিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

এ কি করিলে চামেলী? বাহির হইতে লতামণ্ডপের সৌন্দর্য্য দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলে না? চক্ষু বুজিয়া আলো দেখিতে পারিলে না? অন্ধকারে বিহ্বল হইয়া পড়িলে? তা পারিবে না—সে শিক্ষা তোমার নাই, তুমি দেখিতে শিখিয়াছ—শুনিতে শিখ নাই, হাঁসিতে শিখিয়াছ—কাঁদিতে শিখ নাই, ভালবাসিতে শিখিয়াছ—ভালবাসা শিখ নাই, তুমি স্থির থাকিতে পারিবে কেন? তুমি মোহে উন্মত্ত, মুগ্ধ নহ, তুমি স্থির থাকিতে পারিবে কেন? যে মুগ্ধ সে তন্ময়, সে সকলসময়েই তাহাতে গ্রথিত। যে উন্মত্ত সে তেমন হইবে কেন? সে তাহাকে না পাইলেও স্থির থাকিবে কেন? সে ছট্‌ফট্ করিবে। চামেলি! তোমার অপরাধ নাই—তুমি রূপে মুগ্ধ, তুমি তোমার সে রূপ, নয়নের অন্তরালে রাখিবে কেমন করিয়া? তাহা যে দেখিবার—তুমি যে তাহা দেখিয়াই আসিতেছ, তুমি তাহা ভাবিয়া সুখী হইবে কেমন করিয়া? তোমার অপরাধ নাই!

রাজু চলিয়া যাইলে চামেলী আর স্থির থাকিতে পারিল না, ভাবিল,—আমিও যাইব, আমিও সেই রূপসমুদ্রে গিয়া অবগাহন

করিব, আর তাহার তরঙ্গে পড়িয়া যদি সে—চামেলী আর ভাবিতে পারিল না।

চামেলী তখন ব্যস্ত হইয়া বাঁদীদিগকে বিদায় দিল। বাঁদীরা চলিয়া যাইলে চামেলী দ্বার অবরুদ্ধ করিল। দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া চামেলী করিল কি? চামেলী আপনার সে বেশভূষা সমস্ত পরিত্যাগ করিল। সেই চন্দ্রে কলঙ্ক—পদ্মে শৈবাল—সিতে অসিত—সৌন্দর্য্যে সমুজ্জল ঘোর কৃষ্ণ কেশকলাপ কাটিয়া ফেলিল! এখন আর অশ্রু নাই, চামেলী জল দিয়া অঞ্জনের অবশিষ্ট দাগ টুকুও ধুইয়া ফেলিল। তখন একবার ভিত্তিবিলম্বিত আদর্শে চামেলী চামেলীকে দেখিতে যাইল, দেখিতে পাইল না। চক্ষে দরদরিত ধারা, চামেলী ঘরের চারিদিকে দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।

"হায় পোড়া কপালি! এমন কাজও করিতে হয়?" চামেলী ভাবিতে ভাবিতে শিহরিয়া উঠিল। ক্রমে ভাবিল,—ঠিক্ হইয়াছে, সে বাতাস যখন নাই, তখন এই লতার ঐ শ্যামল মসৃণ কোমল পত্রাবলী থাকিবে কেন? উহা যে প্রকৃতির নিয়ম। এমনই হইবে—দেখিলে কাঁদিতে হয় এমনই ত' হইয়া যাইবার কথা। ইহার জন্য এত কেন? সে বাতাস যখন বহিবে তখন ইহা তো আবার যেমন ছিল তেমনি হইবে, ইহার জন্য ভাবনা কি? চামেলী আবার দৃঢ় হইল। তখন স্থির হইয়া অঙ্গের যেখানে'যা আভরণ ছিল এক এক করিয়া সমস্ত গুলিই খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর হিন্দুর ভিখারিণী সাজিয়া বাহির হইব ভাবিয়া তাহার সাজগোজ করিতে বসিল। চামেলী আর একবার এইরূপ করিবে বলিয়া সব উপকরণ যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল। তখন রাজু হিন্দু ছিল। চামেলী তখন ভিখারিণী সাজিয়া গৃহ ত্যাগ করিবার কামনা করিয়াছিল, সে শুধু কল্পনাই হইয়াছিল, রাজু স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া চামেলীর সে মনোমোহিনী মূর্ত্তি দেখিতে পায়

নাই। আজ চামেলীর সে সুযোগ আসিল। রাজু যাহাতে একে বারেই না চিনিতে পারে চামেলী আজ তাহার যোগাড় করিতে লাগিল। ভিখারিণী হইয়া একতারা লইয়া রাজুর ছাউনীতে ছাউনীতে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে, চামেলীর এখন ইহাই সাধ। রাজু চিনিতে পারিবে না, যুদ্ধে ভগ্নোদ্যম হইবে না, চামেলী তাহাই চায়, আর চায় শুধু রাজুর সন্দর্শন। চামেলী ভাবিল হিন্দুর এ সরস মধুর গবিবিয়ানাতে চামেলীর সে আশা পরিপূর্ণ হইবে। তবে ভয় সামান্য সৈনিকদের হাতে, চামেলী ভাবিল,—রাজু চামেলীকে ছাড়িয়া যুদ্ধে গিয়াছেন, আর তাঁহার সৈনিক তাঁহার সম্মুখে ভিখারিণীর উপরি অত্যাচার করিতে পারিবে? চামেলী ইহা ভাবিয়াই মন স্থির করিল। চামেলী তখন গেরুয়া কাপড় পরিল, তাহার উপর আজানুলম্বিত এক আলখেল্লা চড়াইয়া দিল, গলায় মোটা রকমে তুলসীর মালা, হাতে বলয়াকারেও তাই, কপালে চন্দনের ফোঁটা, রসকলি নহে, হাতে একতারা। চামেলী সাজিয়া গুজিয়া একবার আয়নার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তখন এ সময়েও তাহার একটু হাসি আসিল। সেখানে যদি কেহ থাকিত, তবে চামেলীকে বলিয়া দিত সে যেন হাঁসিটীও বদলাইয়া ফেলে। চামেলী ভাবিল,— ভিখারিণী তো কাঁদিয়াই বেড়াইবে, হাসিবে কেন?

"এখন এ ঘরের বাহির হই কেমন করিয়া" ভাবিয়াই চামেলী দরজার সম্মুখে যাইল। একটু ভাবিয়াই চামেলী ঘরের ভিতর হইতেই ডাকিল,—কে আছ? এক জন বাঁদী জবাব করিল। চামেলী বলিল— এই ভিখারিণীকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়া আয়, বলিয়াই দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে দাঁড়াইল। বাঁদী ভিখারিণীকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, ভাবিল,—ভিখারিণী কখন আসিয়াছিল? কিন্তু তাহার তো আর অন্য কথা কহিবার অধিকার নাই, সে অগ্রে অগ্রে চলিল, ভিখারিণী

পশ্চাতে অতি দ্রুত চলিতে লাগিল। দ্বারে খোজা জিজ্ঞাসা করিল কে যায়? বাঁদী বলিল,—ভিখারিণী। কুমারী বিবির হুকুম। খোজা এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

ভিখারিণী একেবারে বাহিরে আসিয়া বাঁদীর অগ্রেই রাস্তায় পড়িল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, ভিখারিণী অতি দ্রুত চলিয়া গেল। বাঁদী বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

এত যে যাতনা এত যে বেদনা
কে বল দেখিবে বুঝিবে কে ?
সে কোথা যাইল কেন না আসিল
পাষাণে গঠিত হৃদয় রে॥

গঙ্গাতীরে সৈকতভূমিতে হাঁটিতে হাঁটিতে সন্ধ্যা গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল। উষা বলিল,—দিদি! এখন গান রাখ। চল সন্ধ্যা হইয়াছে, শীগ্‌গির জল লইয়া যাই। সন্ধ্যা বলিল তাত' যাবই, যাবার সময় মা গঙ্গার কাছে দুটো মনের কথা বলে যাই। মা যদি দয়া করেন।

উষা বলিল,—মনের কথা কি মুখে বলে ?

সন্ধ্যা। ঐ বোগেই ত' গঙ্গা—জল—কেবল ছুটে ছুটে বেড়ায়।

উষা অপ্রতিভ হইল, বলিল,—দিদি। জগৎ রায় কি আজ রাজা মানসিংহের সহিত দেখা করিয়া আসিয়াছেন ?

"হ্যাঁ" সন্ধ্যা বলিল,—হ্যাঁ, আজ কাকা টাকা সকলে মিলে রাজার নিকট গিয়াছিলেন। আর আকবরের নিকট যাইতে হইবে না। আমাদের এখন এই পাটনা হইতেই উঁহাদের সঙ্গে বরাবর উড়িয়ায় যাইতে হইবে। উড়িষ্যাবিজয়ের পর আমাদের উপায় হইবে।

উষার চক্ষের উপরে একবার সেই চিরপরিচিত আবাস ভূমির

মধুর মূর্ত্তি আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। উষা ভাবিল,—তুমি আসিবে, ভালই, কিন্তু আমার কি হইল? উষা অন্ধকার দেখিল, আবাসভূমি সরিয়া গেল। যাইবার সময় যেন বলিয়া গেল 'না ফিরিলেই বা তোমার কি হইত?" "তাই কি ঠিক্?" উষা ভাবিল,—তাই কি ঠিক্? তা কেন? হয় ত' কিছুই হইত না, উষা অন্তরে শিহরিয়া উঠিল, ভাবিল,—আমি দেশে দেশে ঘুরিয়াও হয় ত' পাইতামনা, কিন্তু এমন করিয়া ত' আশার পথ অবরুদ্ধ হইত না? আমি কেমন করিয়া আবার সেই ঘরে নিশ্বাস ফেলিব? উষা চলৎশক্তি রহিত হইল।

সম্মুখে কলনাদিনী ভাগীরথী, উষা ভাবিল,—ইহাই ত' সকল জ্বালা জুড়াইবার স্থান। তখন সন্ধ্যাকে ডাকিয়া বলিল,—দিদি! আর কত দিন এমন করিয়া বাঁচিব?

সন্ধ্যা বলিল,—বাঁচিয়া কাজ কি? মরিলেই ত' তাহাকে পাইবে, মর না? সন্ধ্যা রাগত হইয়া একটু দ্রুত পদচালনা করিল।

উষা দেখিল,—দিদি বুঝিল না। দিদি রাগিয়াছে—আমার এ ঘ্যানঘ্যানানিতে সন্ধ্যা বিরক্ত হইয়াছে। ভাবিল,—তা হইবারই কথা। আমি কাঙ্গাল—পৃথিবীতে আসিয়া আমার আশা অনেক। আমি পাপী, আমি দয়ার মুখ দেখিতে পাই-না, আমি চারিদিকে কেবল তাহাই খুঁজিয়া বেড়াই। আমার কান্না দেখিয়া যদি কেহ একটু দয়া করিল আমি হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলাম, আমি তাঁহার পায়ে ঢলিয়া পড়িলাম। আমি বোকা, আমি বুঝিতে চাহিনা যে সে ইহা সহ্য করিবে কেন? তাহাকে বিরক্ত করি কেন? উষার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যা দেখিল উষা কাঁদিতেছে। ভাবিল,—কি কুকর্ম্মই করিয়াছি। তখন হাতের কলসী বালিতে রাখিয়া সরিয়া আসিয়া উষার হাত ধরিয়া বলিল, উষা! দিদি আমার। কাঁদিতেছ কেন? আমি রাগ করি নাই, তুমি যাহা ভাবিয়া কাঁদিতেছ আমি তাহা হই নাই—আমি

বিরক্ত হই নাই। আমি বলি আব ভাবিলে কি হইবে? যাহা লইয়া আজও বাঁচিয়া আছ মরিলে কি তাহা থাকিবে? আশায় বাঁচিয়া আছ মরিলে ত' সে আশা আর এ পৃথিবীতে থাকিবে না? তখন যদি তাহাকে পাওয়া যায় তবে ভাবিয়া দেখ দেখি, তখন সে স্বপনের স্বর্গ রাজ্য জাগিয়া চক্ষু মেলিয়া দেখিবে কে? যাহার স্বপন সে যদি জাগিয়া তাহা না দেখিতে পাইল তবে কাহার বুক আনন্দে ভরিয়া যাইবে? আমি কি বুঝিতেছিনা, তোমার কি হইতেছে?, কিন্তু কি কবিবে? মরিলে কি হইবে? পাইবে কি? আশায় বুক বাঁধিয়া চলিযা যাও, নীরবে কাঁদিতে থাক, যিনি শুনিবার তিনি শুনিবেন, এক দিন না এক দিন সে দিন আসিবে। এখন আয় কাপড় কাচিয়া জল লইযা যাই—বলিযা সন্ধ্যা উষাকে টানিয়া আনিল।

সন্ধ্যার মিষ্টি কথা শুনিয়া উষা আরও খানিক কাঁদিল। তাহার পর উডিয্যায় যাইবা পুরুষোত্তমদর্শনে যাইবার পরামর্শ করিতে করিতে দু'জনে বাসায় ফিরিযা আসিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

খট খট করিয়া চারিদিকে খোঁটায় ঘা পড়িতে লাগিল। হুহুশব্দে ভদ্রক নদীর অপর পার লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। চারিদিকে তাম্বু খাটান'র ধূম পড়িয়া গেল। মনুষ্যকলরবের মধ্যে বিকট অশ্ব চীৎকারে লোকে প্রমাদ গণিতে লাগিল। এখানে হাতী, এখানে ঘোড়া, ওখানে উষ্ট্রশ্রেণী, এক মুহূর্ত্তে যেন সে স্থানটী কি এক অশান্তিময় হইয়া উঠিল।

স্থানীয় লোকেরা গতিক দেখিয়া যে যেখানে পারিল পলায়ন করিল। সৈনিকের চীৎকারে গাছে পাখীটী পর্য্যন্ত রহিল না।

তখন কতিপয় প্রধান সৈনিক তদ্বির করিতে লাগিলেন, আর বন্দোবস্তমত জিনিষ পত্র সব সজ্জিত হইতে লাগিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ঠিক হইয়া গেল। ছোট বড় মাঝারি যে যেমন তাহার তেমনি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সেই প্রান্তর মাঠ মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন মহানগরীতে পরিণত হইল। ক্রমে কলরব নিবৃত্তি পাইতে লাগিল। প্রধান সৈনিকেরা চারিদিক্ ঘুরিয়া সব পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাম্বু সব খাটান হইয়া গিয়াছে এবং এইটী সুলেমানের, এইটী কালাপাহাড়ের এইটী খানজামানের ভৃত্যেরা সব নির্দ্দেশ

করিয়া বলিতে দিতে লাগিল। তাঁহারা তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে কি না দেখিতে লাগিলেন।

সুলেমান খানজামান কি কালাপাহাড় তখনও কেহ আসেন নাই তাঁহারা পশ্চাতে আসিতেছেন। অগ্রে সৈনিকেরা আসিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতেছে।

তখনও বেলা আছে, তখনও ঐ ভদ্রকনদীর সলিলতরঙ্গে সূর্য্যকিরণ আছড়াইয়া পড়িতেছে—যেন কত কি বলিতে যাইতেছে, কিন্তু ঐ দেখা যাইতেছে ঐ দুর প্রান্তে জলতরঙ্গ একবার একটু মুখ তুলিয়া আবার খরস্রোতে চলিয়া যাইতেছে,ভ্রুক্ষেপ নাই। ভদ্রকনদী আজ সহস্র সহস্র শত্রুসৈন্যের পদাঘাত পাইয়া মলিনবেশে ছুটিয়া যাইতেছে। তুমি আকাশের সূর্য্য। তুমি দেখিতেছ বই ত' নয়? তুমি এখনও আছ—কালের মাপে না হয় উড়িষ্যার ভাগ্যে আরও একটু সময় আছে; কিন্তু এই যে ভদ্রকপর্য্যন্ত মুসলমান আসিল—এই যে আজ আমায় পদাঘাতে কলুষিত করিল—কই তাহার প্রতীকারের জন্য এখানে ত' কেহই নাই? আর কত দিন? এখান হইতে যাজপুর আর কতটুকু? আমি চলিলাম, বলিয়া নদী তরতরশব্দে বহিয়া চলিতে লাগিল।

বেলা যে টুকু ছিল ক্রমে তাহাও যাইতে বসিল। সৈনিকেরা তখন নদীর ধারে আসিয়া সুলেমানের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে দুর হইতে ধূলি দেখা দিল, তাহার পর শব্দ, তাহার পর সুলেমানের তানজাম দেখিতে পাওয়া গেল। তখন চারিদিক হইতে "আল্লা হো আকবর" বলিয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, সে বিকট শব্দে নদী বন প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে সব নীরব হইল। সুলেমান, খানজামান, কালাপাহাড় আপন আপন তাম্বুতে প্রবেশ করিলেন। যথানিয়মে সকলে সম্মান দেখাইয়া যে যাহার আপন আপন স্থানে গমন করিল।

একজন হাওলদারকে ডাকিয়া কালাপাহাড বলিলেন,—বিপক্ষের রাজ্যে প্রবেশ করিযাছ,সাবধান রাত্রিতে বক্ষা কার্য্যে হুঁসিয়ার থাকিও।

হাওলদার কুর্ণিস কবিয়া চলিয়া গেল। কালাপাহাড আপনাব তাম্বুতে প্রবেশ কবিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুর ঝিঝিট খাম্বাজ, তাল ষৎ।

আর আয় আয়।

কে তোরা দেখিবি আমার ঐ কে পালায়।
কে যে ও কোথায় ছিল, কোথা হ'তে দেখা দিল,
পাষাণে বোঝাই করা এ মোর হিয়ায়।
তাহাতো বলিতে নারি, শুধু গো বলিতে পারি,
কি মধুর সেই দিন জড়িত সুধায়।
এ পাষাণ ভেদি যবে, ঐ ঝরণা কলরবে,
আমি এ পাষাণপ্রেম বলিল ধরায়।
সেই সে আমার হার, আজি গো কোথার যায়,
পলকে পলকে দূরে ফেলিয়া আমায়।
আমি ছুটে ছুটে মরি, তাহাকে ধরিতে নারি,
ঐ যায় সে আমারি কিসেরি আশায়।
মরি আমা না শুধায়।

"কে গায় ঐ?" তাম্বুতে বসিয়া চিত্রাঙ্কিত চামেলীর রূপ দেখিতে দেখিতে বাজ্‌ শিহরিয়া বলিয়া উঠিল,—কে গায় ঐ?

বাহিরে প্রতিহারী জাগিয়া ছিল, ভিতরে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল,—ও কে বাহিরে অনেকদূরে গান গাহিতেছে।

রাজু বলিল,—একজন হাওলদারকে ডাকিয়া আন।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রতিহারী চলিয়া গেল।

নিশার নীরবতায় ঐ অত দূরের গানও বেশ নিকটের বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল।

রাজু শুনিল,—ঐ যায় সে আমারি কিসেরি আশায়
মরি আমা না শুধায়।

রাজু ভাবিল,—ও কে? আমি এই বিলাসবৈভবে মনোমুগ্ধকর সুবর্ণপিঞ্জরে বসিয়া যাহা ভাবিয়া আকুল, ও কে তাহা প্রাণের কবাট খুলিয়া ঐ উন্মুক্তপ্রান্তরে মনের সুখে ছড়াইয়া ফেলিতেছে? আমার প্রাণের দ্বার অবরুদ্ধ, আমি শুধু ভাবিয়া আকুল, আর ও যে কেমন উহার ভাবনাকে বলিয়া বেড়াইতেছে। মরি মরি। উহার দুঃখের শিরায় শিরায় কেমন সুখের প্রবাহ। রাজু ভাবিল,—যাহার ভাবনা নাই—যাহার দুঃখ নাই—সে পশু, আর যে তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলনা—চক্ষের জলে তাহা বিধৌত করিতে পারিলনা—সে পশু অপেক্ষাও অধম। আমি আমার সে প্রবহমাণ প্রবাহকে চাপিয়া রাখিয়া আর এক পথে যাইতেছি—আমি যুদ্ধ জয় করিতে যাইতেছি—আমি যশ উপার্জন করিতে যাইতেছি—আমায় ধিক্। আমি কাহার আশায় যাইতেছি? তাহাকে না সুধিয়া আমি কাহার পানে ছুটিতেছি? ও যে ঠিক্ বলিতেছে। আমার মাথায় বজ্রাঘাত হউক্। রাজু বসিয়াছিল উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রতীহারী সেলাম করিয়া বলিল,—হাওলদার আসিয়াছেন।

রাজু। লইয়া আইস।

হাওলদার আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। রাজু জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন পাহারা সব ঠিক্?

হাওলদার বলিল, হুজুরের হুকুম মত সবই ঠিক্।

রাজু বলিল,—আচ্ছা, ঐ বাহিরে কে গান গাহিতেছে ?

হাওলদার বলিল,—অনেকক্ষণ হইতে শুনিতে পাইতেছি, কে তাহা অনুসন্ধান করি নাই।

রাজু বলিল,—আচ্ছা, সন্ধান লইয়া আইস।

হাওলদার চলিয়া গেল।

রাজু ভাবিল,—ও কে ? এই এত রাত্রে যে আপনার মনের কথা গাহিয়া বেড়ায়, সে কে ? লোকালয়ে কি তাহার স্থান নাই ? সংসারে কি তাহার মনের কথা বুঝিবার কেহ নাই, তাই নিদ্রিত পৃথিবীর নিস্তব্ধ অঙ্কে মুখ লুকাইয়া আপন কাহিনী ব্যক্ত করিতেছে ? ভাবিতে ভাবিতে রাজু ভাবিল,—তাই বুঝি হয়। যাহাকে কাঁদিতে হয় জাগ্রত সংসারে তাহার আশ্রয় মিলে না। সংসারের বত কাজ, তাহার অবকাশ কোথায় যে সে তোমার কান্না শুনিবে ? তাই নীরবে একাকী কাঁদিতে হয়। আমি তোমার নিকট কাঁদিলাম, তুমি শুনিলে না, সে কান্নায় তৃপ্তি নাই। কাঁদিয়া যে সুখ সে কান্নায় তাহা ঘটে না, তাই আপন মনে কাঁদিতে হয়। এ গায়কের গানে আমার চক্ষু ফুটিল। সংসার অসার যশের আশায় ঘুরিতেছে, কিন্তু মনুষ্যজীবনের যাহা সার, যাহা নহিলে মনুষ্য পশু, সে কোমলতা—প্রাণের সে কাতরতা—শুনিতে ত' কই কাহাকেও দেখিতে পাই না ? বুঝিতে বলিনা, শুধু শুনিতে, এ অনন্তসংসারে তাহাও এত দুর্লভ কেন ? তবে এ সংসারের প্রলোভনে কাজ কি ? যশের আশায় প্রয়োজন কি ? রাজু ঘরের ভিতর বেড়াইতে লাগিল, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না।

ভাবিল,—আমি চাঁদেলীকে ছাড়িয়া আসিলাম কেন ? সে যে আমার এ বিপুলসংসারে এক মাত্র সব। তাহারই জন্তই যে ব্রাহ্মণ-সন্তান আজ মুসলমান। রাজু শিহরিয়া উঠিল। হটাৎ তাহার মনে পড়িল আজ কয়েকদিন হইল খানজামানের কাছে কে একজন কি

এক সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল, সংবাদ কি তাহা প্রকাশ নাই, তবে শুনি সংবাদ তাঁহার বাড়ী হইতে আসিয়াছে। রাজু চক্ষু মুদিল, ভাবিল,—সে সংবাদ কিসের ?

তখন প্রতিহারী প্রবেশ করিয়া বলিল,—হাওলদার হাজির।

রাজু আসিতে বলিয়া পর্য্যঙ্কে বসিয়া পড়িল।

হাওলদার আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—একজন ভিখারিণী, স্ত্রীলোক। ঐ নদীর ধারে বসিয়া গান গাহিতেছে।

রাজু বসিয়াছিল—দাড়াইয়া উঠিল, বলিল—ভিখারিণী স্ত্রীলোক। সে এই গান গাহিতেছে ?

হাওলদার একটু থতমত খাইয়া গোড়াতে বলিল, রাত্রিতে সেইরূপ বলিয়াই বোধ হইল।

রাজু বলিল,—দেখা ঠিক হইয়াছে। স্ত্রীলোকই সম্ভব।

হাওলদার হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

রাজু বলিল,—চল আমি নিজে গিয়া দেখিয়া আসি।

হাওলদার সাহেব একটু মুলিয়ানা দেখাইলেন, বলিলেন,—স্ত্রীলোকটী সামান্য ভিখারিণী মাত্র, লইয়া আসিব কি ?

রাজু ভ্রকুটী করিলেন। হাওলদার ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। বলিল—হুজুর। গোলামের দোষ মকুব হয়।

রাজু বলিলেন,—ভয় নাই, চল। তখন হাওলদার অগ্রে অগ্রে রাজু পশ্চাতে তাম্বু হইতে বাহির হইলেন। বাহিরে বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। সেই পরিষ্কৃত নীল নভোমণ্ডল বহিয়া সে সঙ্গীতস্রোত আরও সুস্পষ্টরূপে রাজুর কর্ণে প্রবেশ করিল। রাজু শুনিল,—

কে যে ও কোথায় ছিল, কোথা হ'তে দেখা দিল,
পাষাণে বোঝাই করল এ মোর হিয়ায়।

তাহাতো বলিতে নারি, শুধু গো বলিতে পারি,
কি মধুর সেই দিন জড়িত সুধায়।
এ পাষাণ ভেদি যবে, ঐ ঝরণা কলরবে,
আমি এ পাষাণপ্রেম বলিল ধরায়।

বাজু বিহ্বল হইল, ভাবিল,— তা ঠিক্, সে দিন বড় মধুর। চামেলী-নির্ঝরিণী যেদিন এ পাষাণ ভাঙ্গিল—পাষাণের মত আমার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া আমায় ভাসাইয়া লইয়া গেল—সে দিন বড়ই মধুর! তা যাক্, যাহা হিয়ার উপরে ফুটিয়াছে এখন সে কোথায়? তাহাকে কি পাইব না? আমি কেন ছাড়িয়া আসিলাম? সে সংবাদবাহক কোথায় গেল? বাজু ভাবনায় অস্থির হইল।

হাওলদার বলিল,—এই নদীতীর ঐ দেখুন ভিখারিণী বসিয়া রহিয়াছে।

বাজু দ্রুত তাহার দিকে যাইল।

ভিখারিণী বসিয়াছিল, দুটী মানুষ আসিতেছে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বোধ হইল যেন পলাইয়া যাইবে।

বাজু তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে যাইয়া বলিল,—ভয় নাই, তোমার গান শুনিতে আসিয়াছি। তুমি কে?

ভিখারিণী চিনিতে পারিল, একটু জড়সড় হইল, এদিক্ ওদিক্ কাপড় গুছাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাজু বলিল,—ভিখারিণি! তুমি ভয় পাইতেছ কেন? বল তুমি কে?

ভিখারিণী ভাবিল তোমার সম্মুখেও যদি ভয় করিব তবে গৃহ হইতে বাহির হইলাম কেন প্রভু? তখন ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে ভিখারিণী বলিল,—আমি ভিখারিণী।

বাজু ভাবিল, এ কি!!! এ কাহার কণ্ঠস্বর! ব্যস্ত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কে?

এইবার ভিখারিণী বড় বিপদে পড়িল। এইবার বুঝি ধরা পড়ি ভাবিয়া ভিখারিণী চমকিত হইয়া পড়িল এবং অতিকষ্টে অর্দ্ধবিজড়িত-স্বরে বলিল,—বলিলাম ত' আমি ভিখারিণী। বলিয়াই একতারায় সজোরে ঝঙ্কার দিল। রাজু বিস্মিত হইয়া ভিখারিণীর দিকে চাহিয়া রহিল।

ভিখারিণী তখন বেগোছ দেখিয়া ঝঙ্কারের উপর ঝঙ্কার দিতে দিতে গান ধরিল। সুর আকাশে উঠিল। রাজু ভাবিল ঐ চন্দ্রলোক হইতে বুঝি কে গান গাহিতেছে।

গাহিতে গাহিতে ভিখারিণী সেই নদীসৈকতের উপর দিয়া কোথায় চলিয়া যাইতে লাগিল। রাজু স্তম্ভিত। ভাবিল,—স্বর্গের সুধা স্বর্গেই চলিল।

ছাউনীতে দ্বিপ্রহরের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। রাজুর চমক ভাঙ্গিল। হাওলদারকে জিজ্ঞাসা করিল,—ও কি?

হাওলদার বলিল,—উহা সৈনিকদের বাঁশি। রাত্রি আর বেশী নাই, এইবার তাম্বু উঠাইয়া আমাদিগকে রওনা হইতে হইবে।

রাজু ভাবিল,—সংসারের মুখে ছাই। বলিল,—এখান হইতে যাজপুর কত দূর? হাওলদার বলিল,—অতি নিকটে।

রাজু বলিল,—তুমি যাও, সব বন্দোবস্ত কর'গে। আমি যাইতেছি।

হাওলদার চলিয়া গেল। তখনও ঐ দূর হইতে ভিখারিণীর সঙ্গীতস্বর বাতাসে ভাসিয়া ভাসিয়া ধীরে ধীরে রাজুর নিকট আসিতেছিল। রাজু একবার ভাবিল,—সংসারের মুখে ছাই, আমি চলিয়া যাই, ও ভিখারিণী কে? আবার ভাবিল,—লোকে হাঁসিবে, তা পারিব না। লোকে কাপুরুষ বলিবে সহ্য করিতে পারিব না। যুদ্ধে মরিব। ও ভিখারিণী কে? আর একবার দেখিতে পাইব না? ভাবিতে ভাবিতে রাজু ছাউনি অভিমুখে যাইতে লাগিল।

সেই নিস্তব্ধ নিশীথে শব্দশূন্য প্রান্তরে কেবল সেই স্রোতস্বতীর স্রোতোজল কলকল ছলছল রবে যেন কত কি বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। রাজু অন্যমনস্কে একবার সে মধুর ধ্বনি শুনিল। আবার বাঁশী বাজিয়া উঠিল, রাজু তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সংবাদের উপর সংবাদ আসিতে থাকিল। মুকুন্দদেব জানিতে পারিলেন পাঠান প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। এখন ত' আর শুধু সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মুকুন্দদেব প্রধান সেনাপতিকে ডাকিলেন। সেনাপতি অভিবাদন করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মুকুন্দদেব বলিলেন,—"সদাশিব।" সেনাপতির নাম সদাশিব রাও। মহারাষ্ট্রদেশীয়। সদাশিব আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মুকুন্দদেব বলিলেন,—সদাশিব। পাঠান আসিয়াছে। সংবাদ পাইলাম কাল তাহারা ভদ্রকে ছাউনি করিয়াছিল। আজ অগ্রসর হইতেছে। তুমি পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া তাহাদের গতি রোধ কর। কিন্তু দেখিও তাহাদের গতি লক্ষ্য করিও। তাহারা কোন পথে আসিয়া নগর আক্রমণ করিবে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিও। আর নগররক্ষার ভার আমার উপর রহিল।

সদাশিব অবনতশিরে "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল।

সৈন্য সব সজ্জিতই ছিল। সদাশিব বাহিরে আসিয়াই সৈন্যদিগকে বলিলেন,—মহারাজের হুকুম, পাঠান আসিয়াছে, ভদ্রকে কাল তাহারা ছাউনি করিয়াছিল, আজ এই দিকেই আসিতেছে, তাহাদের গতিরোধ করিতে এখনি আমাকে অগ্রসর হইতে হইবে। তোমরা পৃথিবীর

সুসন্তান আইস আমাব সম্মুখীন হও। আমি পাঁচহাজার সৈন্য লইযা পাঠানেব বলবীর্য্যেব পবীক্ষা করিব।

"জয় মহাবাজেব জয়। জয় বিবজা মাতার জয়।" বলিয়া সকলে চীৎকার করিযা উঠিল। সদাশিব উপযুক্ত মত পাঁচহাজাব সৈন্য লইযা বৈতবিণী পার হইযা গেলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বৈতবিণীর জলে অন্ধকারেব কালো ছায়া পডিতে আরম্ভ করিযাছে। সদাশিব নদী পার হইয়াই সৈন্য-দিগকে বলিলেন,—আমরা পাঁচহাজাব লোক যাইতেছি, কিন্তু সাবধান, এমনি করিযা যাইতে হইবে যেন এ গমনে গাছেব পাখীটীও না উডে।

আব এক কথা। এখান হইতে ঠিক্ সোজা পথে বরাবর উত্তবমুখে চলিলে ভদ্রক দুই দিনে যাওযা যায। কিন্তু আমাদেব ত' আব ববাবব ভদ্রকপর্য্যন্ত যাইতে হইবে না, পাঠানেবাও আসিতেছে, সুতবাং আমবা এই পশ্চিমোত্তব বাঁকা পথ ধবিযা ববাবর বাযপুরেব জঙ্গলের ভিতব প্রবেশ কবি। সেখানে নিভৃতে থাকিযা পাঠানেব অপেক্ষা করিব। সংবাদ পাইযাছি তাহাবা সোজাপথেই আসিতেছে। সুতবাং তাহাবাও বাযপুবেব পথে আসিবে আব আমরাও তাহাদিগকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ কবিব। এখান হইতে ছয ক্রোশ যাইলেই সেই জঙ্গল।

সদাশিব অগ্রে অগ্রে আর পশ্চাতে বেশ দূরে দূরে পাঁচ পাঁচ শত লোকের এক একটী দল। প্রত্যেক দলের এক এক জন সদ্দার। কাহাবও মুখে কথা নাই। সকলেই নিঃশব্দপদসঞ্চাবে রাজপথ অতিক্রম কবিযা মাঠে পডিল। সেই অপথ দিযাই তাহাবা বাযপুরের জঙ্গলে যাইবে। সকলেই শূন্যপদে, সকলেই পদব্রজে যাইতে লাগিল। সঙ্গেব অশ্বসকলকে অনেকভাগে বিভক্ত করিয়া

খুব তফাতে তফাতে ভাগাভাগি করিয়া লইয়া আসিতে লাগিল। তাহাতে আর গোলের সম্ভাবনা রহিল না। দুইটী হাতীর পৃষ্ঠে দুইটী কামান তাহা সর্ব্বাগ্রে প্রেরিত হইল।

"সব ঠিক হইল" যাইতে যাইতে সদাশিব ভাবিলেন,—সব ত' ঠিক হইল। এখন একবার পাঠানের অজ্ঞাতে পাঠানকে আক্রমণ করিতে পারিলে হয়। সদাশিব একবার এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—পশ্চাতে সৈন্যশ্রেণী আসিতেছে। কোথাও সাড়াশব্দ নাই। বেশ নিস্তব্ধে আসিতেছে। সদাশিব তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সুদূর রাজপথের দিকে চাহিয়া দেখিলেন কোথাও মনুষ্য নাই। দুটী একটী পথিক যাইতেছে মাত্র। সদাশিব চলিতে লাগিলেন। তখন বেশ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। সদাশিব ভাবিলেন,—ভালই হইয়াছে। জ্যোৎস্না উঠিবার পূর্ব্বে এই অন্ধকারে অন্ধকারেই রায়পুরে পৌছিতে হইবে।

তাঁহারা ক্রমে বাঁকিয়া যাইতেছেন। রাজপথ তখনও বড় দূরে পড়ে নাই। তখনও তীব্রদৃষ্টিতে দেখিতে পারিলে রাজপথের মনুষ্য লক্ষিত হয়। সদাশিব একবার রাজপথের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার যেন বোধ হইল কে একজন একটা গাছের তলায়—যেখানে আরও একটু বেশী অন্ধকার—বেশ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সদাশিব ভাবিলেন,—ও কে? আমাদের ত' কেহ এমন সময়ে অমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে না? দেখিলেন,—মানুষই বটে। খুব লম্বা একটা মানুষ। সদাশিব ভাবিলেন,—এত লম্বা মানুষ। তবে কি ঘোড়ায় চড়িয়া কেহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? সদাশিব ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খানিক আসিয়া দেখিলেন তাহাই বটে। ঘোড়ায় চড়িয়া একটা লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সদাশিবের সন্দেহ হইল। ভাবিলেন এমন করিয়া

এই অন্ধকারে ঘোড়ায় চড়িয়া বাজে লোক দাঁড়াইয়া থাকিবে কেন? এ নিশ্চয়ই শত্রুর চর। সদাশিব কালবিলম্ব করিলেন না বন্দুক উঠাইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিলেন।

যে দাঁড়াইয়াছিল সেও সদাশিবকে দেখিতেছিল। সদাশিবকে বন্দুক উঠাইতে দেখিয়াই সজোরে অশ্বে কশাঘাত করিল অশ্ব বায়ু-বেগে বরাবর রাজপথে উত্তরমুখে চলিয়া গেল। সদাশিব আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু স্থির করিলেন যে শত্রুর চর আমাদের গন্তব্য পথ লক্ষ্য করিয়া চলিয়া গেল। ভাবিলেন,—তবে কি আর এ পথে যাওয়া হইবে না? সদাশিব খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

একজন সর্দ্দার দৌড়াইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—লোকটা গেল কোথায়?

সদাশিব বলিলেন,—তুমিও দেখিয়াছ? সর্দ্দার বলিল,—আমি অনেক ক্ষণ হইতেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু অন্ধকারে কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। পরে আপনার বন্দুকের আওয়াজে ছুটিয়া আসিলাম।

সদাশিব বলিলেন,—আমার গুলি ব্যর্থ হইয়াছে। লোকটা পলায়ন করিয়াছে।

সর্দ্দার বলিল,—আপনার কি বোধ হয়? আমি ত' পাঠানের চর বলিয়া মনে করি।

সদা। আমিও তাই ভাবিতেছি। লোকটা নিশ্চয়ই চর। আমাদের গতি লক্ষ্য করিয়া চলিয়া গেল।

সর্দ্দার জিজ্ঞাসা করিল,—তবে এখন কোন পথে যাওয়া যায়?
সদাশিব বলিলেন,—আমিও তাই ভাবিতেছি।

তাঁহারপর বলিলেন,—"শিবরাম!" সর্দ্দারের নাম শিবরাম। শিবরাম! তোমার অতুল পরাক্রম। তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে আমি তোমাকে ডাকিব বলিয়াই মনে করিতেছিলাম।

শিবরাম যোড়হাত করিয়া বলিল,"কি হুকুম?" সদাশিব বলিলেন,—যেমন যাওয়া যাইতেছে তেমনিই যাওয়া যাক্। তুমি সমস্ত সৈন্যের নেতা হইয়া এই পথেই রায়পুরের জঙ্গলে চলিয়া যাও। আর আমি ঐ চরের পশ্চাৎ গমন করি। এখনও অধিক দূর যাইতে পারে নাই। আমি গিয়া তাহার বধ সাধন করি। পাঠানের নিকট এ সংবাদ পৌঁছিতে না পৌঁছিতে উহাকে মারিয়া ফেলিতে পারিলে আমাদের মঙ্গল হইবে। কি বল?

শিবরাম বলিলেন,—তাহা ঠিক্। কিন্তু এ কার্য্য আর অপরের দ্বারা হয় না?

সদাশিব শিবরামের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন,—শিবরাম। তোমার অসীম সাহস, অতুলনীয় কার্য্যদক্ষতা, তোমায় দিয়া এ কার্য্য অনায়াসে সাধিত হয়। কিন্তু তোমায় পাঠাইয়া আমি নিশ্চিন্তে সৈন্যচালনা করিতে বোধ হয় পারিব না। উহাতে যে ধীরতার প্রয়োজন, বড় উৎসুক্যে তাহা রাখিতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না। অতএব আর সময় নষ্ট করিয়া কাজ নাই। আমি যাহা বলিলাম তাহা কর। সৈন্যদিগকে ও অন্যান্য সর্দ্দারদিগকে ইঙ্গিতে সমস্ত বুঝাইয়া সত্বর রায়পুরাভিমুখে গমন কর। আমি একাকী বলিয়া চিন্তা করিও না। তোমরা এই রাজপথের অধিক তফাৎ দিয়া যাইওনা। আমার নিকট এই বাঁশী রহিল, হুঁসিয়ার হইয়া থাকিও, আওয়াজ পাইলেই সঙ্কেতমত কার্য্য করিও।

সদাশিব আর দাঁড়াইলেন না, তৎক্ষণাৎ অশ্বে কশাঘাত করিলেন অশ্ব বায়ুবেগে ছুটিয়া গেল।

শিবরামও সেনাপতির উপদেশমত রায়পুরাভিমুখে সৈন্যচালনা করিতে লাগিলেন।

——:•:——

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এ পৃথিবীতে যিনি সর্ব্বময় তিনিই বলিতে পারেন ইহার রহস্য কি? তোমার আমার তাহা স্বপ্নেরও অগোচর।

সদাশিব অশ্বচালনা করিলেন শত্রুসংহার করিতে, শিবরাম সৈন্য চালনা করিলেন শত্রুর মূলোচ্ছেদ করিতে। যাহার যাহা আবশ্যক সে তাহা সম্পাদন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কাহারও অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু ঐ যে কে, যাঁহার ইঙ্গিতে ভূধর সাগর হয়, সাগর ভূধর হয়, তিনি কি করিবেন তাহা জানিতে পা'র কে? সদাশিব কি শিবরাম কেহই জানিতে পারিলেন না কোথা হইতে কি হইবে? কি করিতে কি ঘটিবে?

সদাশিব তীরের মত ছুটিয়া গেলেন। আপনার সৈন্যশ্রেণী হইতে অনেক দূরে চলিয়া গেলেন।

আর শিবরাম, তিনিও চুপ করিয়া রহিলেন না। যতদূরসম্ভব বেগে সৈন্যচালনা করিতে লাগিলেন।

শিবরাম উত্তর-পশ্চিম-কোণ ধরিয়া বরাবর জঙ্গলের দিকে যাইতে-ছেন। যে জঙ্গলে তিনি যাইবেন তাহার কিয়দংশের নাম বায়ুপুরের জঙ্গল। কিন্তু সে জঙ্গল বড় ছোট নয়। উড়িষ্যার পশ্চিমাঙ্গ চাপিয়া

যে গিরিশ্রেণী সংগ্রথিত তাহাকে নীলগিরি বলে। আর সেই নীল গিরির উপত্যকা হইতেই এ জঙ্গল বরাবর বিস্তৃত। এখন অনেক স্থানে জঙ্গল কাটিয়া লোকালয় হইয়াছে। এখন আর তত বড় বিস্তৃত জঙ্গল নাই। যে সময়ের কথা এখানে বিবৃত হইতেছে তখন এ জঙ্গল বড় ভারি জঙ্গল ছিল। সদাশিব সেই জঙ্গলের অভিমুখে যাইতেছেন। যেখানে আসিয়া সেই বিস্তৃত জঙ্গল রাজপথে মিলিত হইয়াছে সেই স্থানের নাম রায়পুর। লুক্কায়িতভাবে পাঠানবাহিনীকে আক্রমণ করিবার সেই উপযুক্ত প্রদেশ। সদাশিব অন্ধকারে দূরস্থিত নীল-গিরির সেই ভীষণ বিশাল কাল ছায়া দেখিতে দেখিতে তদভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

কাহারও মুখে কোন শব্দ নাই। প্রান্তরের পর প্রান্তর পার হইয়া সেই শব্দশূন্য সৈন্যরাশি চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের সমপদ-পতনে পৃথিবীবক্ষ হইতে কেবল একটা অস্ফুট গম্ভীর শব্দ সমুত্থিত হইতেছে মাত্র।

রাত্রি যতই বাড়িতে লাগিল, অন্ধকারও তত বিশালমূর্ত্তিতে পৃথিবীকে আক্রমণ করিতে লাগিল। মাথার উপরে স্বচ্ছ নীলাকাশ, আকাশে অসংখ্য তারকারাজী, কে যেন শতসহস্র দীপমালা মালাকারে সাজাইয়া রাখিয়াছে। তাহারা জ্যোতির্ম্ময়, কিন্তু সে জ্যোতি পৃথিবীতে পৌছে না, কেবল উপরে চাহিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। তারার জ্যোতি শুধু নয়নতারায় প্রতিফলিত হয়। তারায় তারায় এমনিই প্রীতি, এমনই মনের মিল।

শিবরাম আকাশের সে সুন্দর চিত্র দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিল। চৈত্র মাস। সমস্ত দিনের প্রখর উত্তাপের পর এই নৈশবায়ুসঞ্চালনে পৃথিবী এখন একটু শীতল বোধ হইতে লাগিল। সেই শীতল স্নিগ্ধ মৃদুল বাতাসে শিবরামের সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইয়া

গেল। এই যে এত পথ হাঁটিয়া আসিতেছে, এই যে এখনও পথ হাঁটিতে হইতেছে, শিবরামের তাহা মনেও পড়িতেছে না। একেবারেই শিবরামের পথশ্রম বোধ হইতেছে না।

আর দুই ক্রোশ আছে। আর দুই ক্রোশ যাইতে পারিলেই রায়পুরে পৌছান যায়। শিবরাম শীঘ্র যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। সৈন্যদিগকে বলিলেন,—আর দুই ক্রোশ আছে মাত্র। আসিয়া পড়িয়াছি আর কি। এইবার একটু পা চালাও। সকলে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

তখন শিবরাম ভাবিল,—আমরা ত' আসিয়া পড়িলাম। এখন আমাদের প্রভু কোথায়? কই এখনও ত' তাঁহার কোন সঙ্কেত পাইলাম না? শিবরাম সোৎসুকে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল কেহ কোথাও নাই। তখন শিবরাম একবার আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল, ইচ্ছা কত রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া লয়। আকাশ পানে চাহিয়াই শিবরাম দেখিল পশ্চিমাকাশে একখানি ঘোররক্ত মেঘ উঠিতেছে। মেঘের বর্ণ দেখিয়াই শিবরাম শিহরিয়া উঠিল। অত কাল—অত গম্ভীর মূর্ত্তি—দেখিয়া শিবরাম ভাবিল গতিক ভাল নহে। কিন্তু ইহার ত' আর উপায় নাই। শিবরাম সৈন্যদিগকে আরও দ্রুত চলিতে বলিল।

বলিলে কি হয়, বায়ুর গতির সহিত ত' আর মানুষের গতির তুলনা হয় না? মেঘখানি বায়ুর উপর চড়িয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। যে এতক্ষণ ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলনকোমল হইয়া বহিতেছিল, সেই মলয়সমীর, এখন প্রবল-তরঙ্গক্ষোভগম্ভীরগুণগুণায়মান হইয়া চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। এত অন্ধকার হইল যে আপনার শরীর আপনি দেখিতে পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। শিবরাম শত চেষ্টা করিয়াও সৈন্য

শ্রেণী ঠিক্ রাখিতে পারিলেন না। এদিকে অশ্বের চীৎকার, ওদিকে হাতীর বিকট শব্দ, শিবরাম বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। সে প্রবল বায়ুর বেগ সহ্য করিয়া যদিও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে থাকা যায়, কিন্তু তাহারও উপায় রহিল না। দেখিতে দেখিতে মুষল-ধারে বৃষ্টি আর সঙ্গে সঙ্গে করকাপাত আরম্ভ হইল। গুলির আঘাত সহ্য করা যায়, যুদ্ধ করিতে করিতে শত অস্ত্রাঘাতও বুঝি ইহা অপেক্ষা মৃদু, কিন্তু সৈন্যেরা এমন নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইযা সে শিলাবাশির তীব্র আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, বৃক্ষান্তরালের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সুতরাং ছোড়ভঙ্গ হইতে হইল, অগ্রসর হইতে পারিল না। উপায নাই। শিবরামও তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন দলে দলে এদিক্ ওদিক্ গাছের অনু-সন্ধানে যাইল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায না। গাছ অনুসন্ধান করিতে করিতে কে কোথায় কত তফাৎ হইযা পড়িল তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। যাহারা শিবরামের কিছু নিকটে ছিল তাহারা কোনমতে একত্রিত হইল। গাছের পর গাছ পড়িতেছে, আশ্রয কোথায়? শিবরাম ভাবিলেন বিধাতা বিমুখ, পাঠানের অপরাধ কি? শিবরাম নীরবে বিধাতার আক্রমণ সহ্য করিযা সেই রাত্র পূর্বাভিমুখেই চলিতে লাগিলেন। যাহারা মিলিয়া ছিল তাহারাও তাঁহার সহিত চলিতে লাগিল। শিবরাম সকলকে হাত ধরাধরি করিযা আসিতে বলিলেন। যতদূর সম্ভব তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মুকুন্দদেব প্রমাদ গণিলেন। সদাশিবকে পাঠাইয়াই মুকুন্দদেব বিবজাদেবীর মন্দিরে গিয়াছিলেন। খানিক পরেই এই তুমুল ঝড বৃষ্টি। মুকুন্দদেব ভাবিলেন,—কিছুই হইল না, যাহা ভাবিযা যাহা কবিলাম তাহার বুঝি কিছুই হইল না। এ ঝড বৃষ্টিব বেগে সদাশিবেব সৈন্য নিশ্চযই ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইযা পড়িযাছে। যে জন্য আমার একমাত্র বল সদাশিবকে প্রযোগ কবিলাম, বিধাতা তাহা ব্যর্থ কবিলেন। মুকুন্দদেব খানিক স্থিবভাবে বসিযা রহিলেন।

দেবীব সন্ধ্যাবতি হইয়া গিযাছে। আজ মহারাজ আসিয়াছেন বলিযা মন্দিরে অনেক লোক। দামোদব পাণ্ডা আজ বড ব্যস্ত। ইহার বসিবার স্থান হইতেছে না, দামোদর তাহাব বন্দোবস্ত করিতেছেন। এখানে বৃষ্টিব ছাট আসিতেছে, দামোদর তাহাব উপায় করিতেছেন। ওখানে স্থানেব জন্য লোকে বিবাদ করিযা গোলমাল করিতেছে, দামোদর যাইযা মধুরবাক্যে তাহা মিটাইয়া দিতেছেন। দামোদরকে আজ বড়ই পরিশ্রম করিতে হইতেছে। একবার এদিক্ একবার ওদিক্ করিযা কেবল ঘুবিযা বেড়াইতে হইতেছে। মহারাজ আসিয়াছেন দামোদর যে একটু তাঁহার কাছে বসিবে, দামোদরের সে সময় হইতেছে না। অভ্যাগত লোকদিগের তত্ত্বাবধান নিজেই করিতেছেন, আব কাহারও উপর ভার দিযা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছেন না। দামোদরের স্বভাবই এই।

মহারাজ বসিয়া আছেন নাভীগয়ার অনতিপ্রশস্ত চত্বরে। সেখানে বড় অধিক লোক নাই। মহারাজেরই কতিপয় পার্শ্বচর মাত্র। সেখানে কোন কোলাহল নাই। কিন্তু তাহারই পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নাট-মন্দির লোকে লোকারণ্য। দামোদর তাহাদেরই বন্দোবস্তে ব্যতি-ব্যস্ত। রক্ষীরা তাহাদের কোলাহল থামাইতে যাইলে দামোদর বারণ করিতেছেন, বলিতেছেন,—তোমরা থাক। এ বলপ্রয়োগের স্থান বা সময় নহে। আমিই ইহাদিগকে বুঝাইতেছি। ক্রমে দামোদরের সরল মধুর ব্যবহারে সকলেই চুপ করিল, সকলেই সুহৃদ্‌ভাবে ভাগা-ভাগি করিয়া আপন আপন অসুবিধা সহ্য করিয়া লইল। তখন আর বড় একটা গোলমাল রহিল না।

সকলেই নিস্তব্ধ। দামোদর আসিয়া মায়ের প্রসাদী বিল্বপত্র দিয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মহারাজ অবনতমস্তকে যুক্তকরে তাহা গ্রহণ করিলেন।

দামোদর মাতৃসম্মুখে ক্ষুদ্র কম্বলাসনে উপবেশন করিলেন।

সোঁ সোঁ গোঁ গোঁ করিয়া বাতাস ছুটিয়া বেড়াইতেছে। জলে ঝড়ে জড়জেড়ি করিয়া একটা বিকটশব্দে পৃথিবীকে কাঁপাইয়া দিতেছে। এই বুঝি মন্দির পড়িয়া গেল, এই বুঝি ইহা ভূগর্ভে প্রোথিত হইল, এই বুঝি কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল, প্রতি মুহূর্ত্তে শুধু ইহাই বোধ হইতে লাগিল।

মুকুন্দদেব ভাবিলেন,—বুঝি প্রলয়কাল উপস্থিত। আর কাহারও হউক আর না হউক বুঝি আমারই ধ্বংসের জন্য ইহার আগমন।

মুকুন্দদেব বিধাতার ভ্রুকুটী দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, যদি সদাশিবকে না পাঠাইতাম, পাঁচ হাজার সৈন্য যদি আজ আমার হস্তচ্যুত না হইত, তবে ইহাতে উদ্বেগের কিছুই ছিলনা। এবং ভালই হইত। পাঠানবাহিনী পথে, আর আমি নগরে। আমার

কিছুই অনিষ্ট হইত না। পাঠানের কিছু না কিছু দুর্দ্দশা হইতই। হইতেছেও বটে। কিন্তু এখন আমার মত নহে। আমার যে পাঁচ হাজার সৈন্য নিরুদ্দিষ্ট হইল।

দামোদর এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। মহারাজকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া দামোদর বলিলেন,—মহারাজ উদ্বিগ্ন হইবেন না। মা'র ইচ্ছায় আমাদের মঙ্গল হইবে। সেনাপতি সদাশিব বড় উপযুক্ত লোক, এ ঝড় বৃষ্টিতে তিনি অবশ্য একটা না একটা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কালই তাঁহার সংবাদ পাইবেন। সদাশিব আপনার সহিত নগরে আসিয়া শীঘ্রই মিলিত হইবেন। আর এ আকস্মিক উৎপাতে পাঠানের'ও বিব্রত হইয়াছে, তাহাদেরও সামলাইতে সময় যাইবে। সদাশিব তাহার মধ্যে একটা না একটা উপায় করিবেন।

দামোদর চুপ করিলে মুকুন্দদেব বলিলেন,—ভাবনা কিছুই নহে, আপনি মা'র স্তব করুন।

দামোদর বলিলেন, উত্তম কথা। আবার বলিলেন,—মহারাজ যদি অনুমতি করেন, তাঁহাকে বলি—যিনি ডাকিলে মা প্রত্যক্ষ হইবেন।

মুকুন্দদেব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি কে?

"তিনি একজন সন্ন্যাসী" দামোদর বলিলেন,—তিনি একজন সন্ন্যাসী। তিনি এইখানেই আছেন। আজ কদিন ধরিয়া তিনি এক শিষ্যসমেত মা'র এখানেই অবস্থান করিতেছেন। তিনি পরম সাধক।

মুকুন্দদেব বলিলেন —তিনি যদি দয়া করেন ভালই হয়, আমরা এ দুর্যোগে পরমসুখে কাল কাটাইতে পারি।

দামোদর উঠিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সকলে সোৎসুকে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

তখন মন্দির হইতে তাল লয় ও সুর সংযোগে সপ্তশতী গীত হইতে লাগিল।

সমবেত লোক সব নিস্তব্ধ। চণ্ডী অনেকেরই জানা, চণ্ডী অনেকেই পাঠ করিয়া থাকে, কিন্তু এমন চণ্ডীপাঠ কেহ কখন শুনে নাই, তাই সব নিস্তব্ধ।

মুকুন্দদেব বিস্মিত। তিনি একমনে উহা শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যাকুল প্রাণ ভক্তিরসে বিহ্বল হইয়া গেল। তিনি বেশ স্থির হইতে পারিলেন।

সন্ন্যাসী ক্রমে দেবীর সম্মুখে আসিয়া গাহিতে লাগিলেন। সকলে যেন দেখিতে পাইল মা সত্য সত্যই মহিষাসুর বধ করিতেছেন। দেখিতে পাইল মা যেন পাষাণময়ী নহেন। মা যেন সাক্ষাৎ!!!

কেহ আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। সকলকেই সসম্ভ্রমে মাতৃসম্মুখে যোড়হাত করিয়া দণ্ডায়মান হইতে হইল। মুকুন্দদেব যোড়হাত। দামোদর যোড়হাত। কেহ জানিতে পারিল না কোথা দিয়া সে রাত্রি কাটিয়া গেল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আর সদাশিব—ঐ যাইতেছে, এই ঘোড়ার পদধ্বনি, এই ধরিলাম ঐ কোথায় গেল, করিতে করিতে বহুদূর ছুটিয়া যাইলেন। তাহাকে ধরিতে পারিলেন না। তাহার পরই সেই আকস্মিক উৎপাত। সদাশিব দিশাহারা হইলেন। ঘোড়ার রাশ টানিয়া ধরিলেন, ঘোড়া থমকিয়া দাড়াইল। কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি দেখিবার জন্য সদাশিব একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিলেন। সে ঘোর অন্ধকারে স্থাননির্ণয় হইল না। অনুমান করিলেন ইহা হরিপুর। এখান হইতে রায়পুর পশ্চাতে প্রায় তিন ক্রোশ। এখন উপায় কি?

সদাশিব ঘোড়া ফিরাইলেন। আন্দাজে রায়পুরের পথ লক্ষ্য করিয়া ঘোড়ায় কশাঘাত করিলেন। ঘোড়া খানিক গিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। সদাশিব দেখিলেন, সম্মুখে রাস্তার উপরে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ শযান। সদাশিব ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িলেন।

বিকট বিদ্যুতের আলোকে সদাশিব দেখিলেন কি ভয়ানক!!! গাছের পর গাছ, সারি গাঁথিয়া বৃক্ষশ্রেণী ভূপতিত। পার্শ্বে অনবরত মড় মড় শব্দ। বাতাসের বেগে নিশ্বাস অবরুদ্ধ, মস্তক বিঘূর্ণিত, দেহ অবসন্ন। জলে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত, শিলাঘাতে শরীর সূচিবিদ্ধ।

সদাশিব বিদ্যুতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সম্মুখে কোথাও বৃক্ষ শূন্য প্রান্তর দেখিতে পাইলে তথায় যাইবেন। বিদ্যুত ত, হইতেছে সদাশিব কিন্তু কিছুই দেখিয়া উঠিতে পারিলেন না। সদাশিব ভাবিলেন,—একি হইল? ভগবন্ এ করিলে কি? সদাশিব স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, ভাবিলেন,—এমনিভাবে মরিতে হইল? শত্রুরুধিরে দেহ প্রক্ষালিত না করিয়া এমনি করিয়া মরিতে হইল? হা ভগবান্ তোমার মনে এই ছিল? সদাশিব ক্ষোভে দুঃখে বড়ই ব্যথিত হইলেন। মাথার উপরে বিধাতার তীব্র কশাঘাত হইতে লাগিল। সদাশিব নীরবে তাহা সহ্য করিতে লাগিলেন।

খানিক পরে যখন মনের সে বেগ কতক প্রশমিত হইল, ভ্রকুটীর উপর ভ্রকুটী দেখিয়া যখন বিধতার সে তীব্র মূর্ত্তি কতক হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকিল, তখন সদাশিবের হৃদয়ে আবার বলাধান হইতে লাগিল। সদাশিব চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন। ভাবিলেন,—বিধাতার যাহা ইচ্ছা করিতে থাকুন আমি রায়পুরে যাইব। আমার সৈন্যেরা কি সেখানে পৌঁছিতে পারে নাই? আমি আসিবার কতক্ষণ পরে এ ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে? সদাশিব আবার কিছু ম্রিয়মাণ হইলেন। ভাবিলেন,—তাইত' বড় বেশী পরেত' নহে? আমি ঘোঁড়া ছুটিয়া আসিয়াছি, তাহারা হাঁটিয়া, তবে নিশ্চয়ই পৌঁছিতে পারে নাই। সদাশিব শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন সর্ব্বনাশ! হয়ত' সব বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সদাশিব হাত কামড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার আর উপায় কি? সদাশিব স্থির করিলেন ইহারত' কোন উপায় নাই। এখানে থাকিয়াই বা কি হইবে? দেখা যাক্ বিধাতার ইচ্ছা কতদূর? সদাশিব সেস্থান হইতে রায়পুরাভিমুখে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। একবার ঘোড়ার সন্ধান করিলেন পাইলেন না। তখন একবার একটা বিদ্যুতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটা বিকট বজ্রাঘাতের সঙ্গে

সঙ্গে বিদ্যুতের আলো হইল, সদাশিব সে আলোয় একবার চারিদিক্ চাহিয়া দেখিয়া আপনার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অতি কষ্টে রাস্তা পার হইলেন। প্রান্তরে পড়িয়া সদাশিব আন্দাজে আন্দাজে রায়পুরের জঙ্গলের দিকে চলিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি আর নাই। প্রভাত হইয়াছে। বড় বর্ষার রাত্রির পরে প্রাতঃকাল যেমন হয় এ প্রভাতেরও মূর্ত্তি সেইরূপ। সেই আধ-দীপ্তি আধ-কালিমা, সেই আধ-কায়া আধ-ছায়া, প্রভাতের সে মূর্ত্তি বড় মোহকর। অনেক দুঃখের পর—অনেক কান্নার পর—সে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন সেই বিরহীর যে অবস্থা হয়, এ প্রভাতেরও এখন তাই। কান্না থামিয়াছে, কিন্তু চোকের পাতায় পাতায় যে রাশি রাশি জলকণা তাহা এখনও শুকায় নাই, হাত দিয়া অনবরত মুছিতে হইতেছে। নয়ন এখনও রক্তিম, মুখ এখনও গম্ভীর, এখনও সে হাসি আসে নাই। মুখে এখনও হৃদয়োচ্ছ্বাস অঙ্কিত। দুঃখে নহে, অভিমানে মুখখানি মলিন, মুখখানি অবনত। এখন আর ধূলায় লুণ্ঠিত নহে, কিন্তু সে ফোঁস-ফোঁসানি এখনও যায় নাই। এখনও কিছু বিহ্বল। এ প্রভাত যে দেখিয়াছে সেই দেখিয়াছে মিলনের এ প্রথমাঙ্ক কত মনোহর। সে বাতাস আর নাই, যাহার আবেগে পৃথিবী বিলুণ্ঠিত হইতেছিল সে বাতাস আর বহিতেছে না। এখন কেবল ঐ অবশিষ্ট ছিন্ন ভিন্ন আলুলায়িত বৃক্ষ গুলির মস্তক কিছু আন্দোলিত হইতেছে, আর টপ্ টপ্ করিয়া পত্রাবলী হইতে জলকণা ঝরিয়া পড়িতেছে। আকাশে শুভ্রবর্ণের মেঘনিচয় ছুটিয়া বেড়াইতেছে,

পূর্ব্বদিকে মেঘের অন্তরালে সূর্য্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, দিঙ্মুখ আধ-ফুটন্ত হইযা তাঁহার পানে অভিমানেব কটাক্ষপাত করিতেছে।

তা হউক্। প্রভাত যেমন হইতেছে তেমনি হইতে থাকুক্। এই অবকাশে আমরা একবাব সুলেমানেব ছাউনিতে প্রবেশ করি। কল্যকার এই তুমুল ঝড বৃষ্টিব পব ইহাদেব কিছু সন্ধান না লওযা ভাল নহে।

সমস্ত রাত্রি জাগরণেব পর আজ এই প্রভাতের প্রথম হইতেই সুলেমান খানজামান কালাপাহাড় সকলেই মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িযাছেন। এখানে তাঁবু ছিঁবিযা ছ্যাঁক হইয়া গিযাছে, ও তাম্বুটী রসিরসা ছিঁড়িযা ঐ মাঠে পড়িয়া কাদায গড়াগডি দিতেছে, এখানে হস্তী অশ্ব ভিজিযা গোময হইযাছে, ওখানে আহারীয় দ্রব্য বিনষ্ট হইযা গিযাছে, ইত্যাদি নানা বিশৃঙ্খলার তত্বাবধান কবিতেছেন। প্রভাত হইতেই আবাব সুবন্দোবস্তের আযোজন হইতেছে।

ভদ্রক হইতে দশ ক্রোশ দক্ষিণে তাঁহাদের এ ছাউনি। এখান হইতে রাযপুর ছয ক্রোশ, হরিপুর চাবি ক্রোশ। এখানে পৌছিযাই কালাপাহাড কাল একজন অশ্বারোহীকে যাজপুরাভিমুখে প্রেরণ কবিযাছিলেন। সদাশিব তাহাকেই বৃক্ষান্তরালে দেখিতে পাইযাছিলেন।

কালাপাহাড তাহাব মুখে সমস্ত সংবাদই জানিতে পারিয়াছেন, এবং স্থিব করিয়াছেন আব এ সোজা পথে যাওযা হইবে না, কিছু ঘুবিযা অন্যদিক্ হইতে যাজপুর আক্রমণ করিতে হইবে। কিন্তু আজ ত' সৈন্যচালনা অসম্ভব। বিশৃঙ্খলার বন্দোবস্ত না করিযা এখান হইতে কোন দিকেই যাওযা হইবে না। তাই সকলে মিলিয়া আজ সকাল হইতেই সেই কার্য্যে করিতে লাগিলেন। সুলেমান হুকুম দিলেন আজ এই খানেই ছাউনি থাকিবে।

—•:•:—

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

তাত' হইল। যাহার যাহা কাজ সে তাহা করিতে লাগিল। সময় বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু আমার কি হইল? আমি যে এই মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তের মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছি, আমার মুহূর্ত্ত আসিল কই? আমার দিন যে কাটে না? আমার সে দিন কবে আসিবে? বিরজার মন্দিরের এক পার্শ্বে—যেখানে কোন লোক জন যায় না—এমত এক স্থানে বসিয়া সুধীর ভাবিতেছে,—সময়ের গতি এত মন্থর কেন? সুধীর অন্যমনস্কে একবার উর্দ্ধপানে চাহিয়া দেখিল। দেখিল আজিকার নভোমণ্ডল বড় পরিষ্কার। মেঘের রেখা মাত্র নাই, একেবারে নিষ্কলঙ্ক। যেন চিত্রিত জলধি। তরঙ্গের ত' কথাই নাই, কোথাও একটী শীকরকণাও উঠিতেছে না, এমন স্থির, এমন প্রশান্ত। সুধীর ভাবিল,—আহা কি মূর্ত্তি!!! বলিল,— আকাশ! তোমার দিন আসিয়াছে। সুধীরের অন্তরের অন্তর হইতে একটী নিশ্বাস পড়িল, ভাবিল,—আমার আর আসিবে কেন? আমার যে তাহা আসিয়াছিল। সুধীর চক্ষু বুজিল, দেখিল,—ঘোর অন্ধকার। চারিদিক্ আবদ্ধ,—বায়ু প্রবেশেরই পথ নাই, তা আলো আসিবে কোথা হইতে? ভাবিল,—আমিত' সাধ করিয়াই এ অন্ধকারে

আসিয়াছি, আলোর আশা করি কেন? সংসারের অদৃষ্টে ঐ দূর আকাশে চাঁদ উঠে, সংসারের তাহাতে কত আনন্দ! সংসার তাহার সেই দূরাগত ধবল বিমল শীতল কিরণ সযত্নে সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া নাচিয়া বেড়ায়। আর আমার এই বুকের উপর চন্দ্রোদয় হইতেছিল, শিরায় শিরায় তাহার জীবন্ত জ্যোৎস্না প্রবাহিত হইতেছিল, ঝলকে ঝলকে তাহার সুধারাশি আসিয়া আমার মর্ম্মে মর্ম্মে তরঙ্গায়িত হইতেছিল। আমি অমর হইতে ছিলাম, আমি স্বর্গের রাজা হইতেছিলাম, অপ্সরার অধীশ্বর হইতে ছিলাম, মন্দার পারিজাতের সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুমরাশির রূপ দেখিতে ছিলাম। শুধু রূপ। রূপ কাহার না আছে? আমি সে রূপে কি না দেখিতেছিলাম? মোহে নহে, সে রূপে মোহ নাই,সে রূপ নির্ম্মল, তাহা পৃথিবীর নহে, তাহা স্বর্গের !!! আমি সে রূপে কি না দেখিতে ছিলাম? কেমন জ্যোতি। তীক্ষ্ণ নহে, কেমন লোচনলোভনীয় কান্তি। তাহা বাহিরের নহে, অন্তরের। সেই স্ফটিকস্বচ্ছ অন্তর হইতে তাহা আপনা আপনি পূর্ণাবয়বে বাহিরে প্রতিফলিত। দেখাইবার জন্য নহে। ঐ পূর্ণ চন্দ্রের বিমল জ্যোতির ন্যায় তাহা ভিতরের, বাহিরে আসিয়া উচ্ছলিত হইয়াছে মাত্র। তাহা অতি শীতল। অতি পবিত্র। অতি মধুর। আমি মন্দারপারিজাতের সেই তেমন রূপ দেখিতে, ছিলাম, অবাধে তাহার মৃদুল স্নিগ্ধ সৌগন্ধ্য আসিয়া আমায় মোহিত করিতেছিল, অল্পে অল্পে তাহার মকরন্দকণা আসিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিতেছিল, এমন সময় আমি উন্মত্ত হইলাম। আমি আত্মঘাতী হইলাম। আমি ইচ্ছা করিয়া সে স্বর্গ হইতে এ নরকে লাফাইয়া পড়িলাম! আমার আর সে স্বর্গের বাসনা কেন? গুটিকত অশ্রুকণা আসিয়া সুধীরের গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। কান্নার পরই শান্তি। জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া অশ্রুরূপে

বাহিরে আসিয়া দেখা দিলেই হৃদয় যেন লঘু হয়। লৌহ গলিয়া যাইলেই যে অকঠিন হয়—তরল হয়। সুধীরেরও হইল। সুধীর আপনার সেই তরল হৃদযের স্বচ্ছ অঙ্গে যেন দেখিতে পাইল ঐ সেই মুখখানি!!! সেই আনম্র অথচ সস্মিত, কান্তিমৎ অথচ শীতল, সৌন্দর্য্যে তরঙ্গায়িত কিন্তু একেবারে অনুদ্বেল, তীরে আসিয়া একটী আঘাতও করিতেছে না। কি নির্ম্মল! কি সরল! কি মনোহর! আবার অশ্রু। হৃদয় আরও তরল হইল, আরও নির্ম্মল হইল। তখন সেই নির্ম্মল অন্তরে সুধীরের যত সব অতীত কাহিনী একে একে সমস্ত আসিয়া তাহাতে প্রতিফলিত হইল। সুধীর দেখিতে পাইল, উষা রামায়ণ পড়িতেছে, আর সুধীর সম্মুখে বসিয়া পড়াইতেছে। উষা অবনতমুখে রামায়ণের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, যেন অতিকষ্টে অতিযত্নে ধরিয়া বাঁধিয়া উষা আপনার চক্ষু রামায়ণের দিকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। সুধীর সেই মুখে সেই চক্ষু দেখিতে পাইল। অনেকক্ষণ দেখিল। দেখিতে দেখিতে যেমনি মনে হইল ইহা স্বপ্ন আর অমনি সুধীরের অন্তরে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। সে উত্তাপে সুধীর ধূ ধূ করিয়া পুড়িয়া যাইতে লাগিল। জ্ঞান হারাইল। আর কিছুই বুঝিতে পারিল না। আর কিছুই দেখিতে পাইল না। একবার কেবল উষা! উষা! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল!!! সুধীর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিল।

উষা কোথায়?

সুধীরের ঐ অত জ্বালা, এমন সময় উষা কোথায়? কিন্তু কে বলিবে উষা কোথায়? বিজ্ঞানের বিমল প্রভায় বৈজ্ঞানিক সর্ব্বজ্ঞ সব দেখিতে পান, তাঁহার অন্ধকার নাই। করতলগত আমলকীফলের ন্যায় তিনি এই বিপুল সংসারের সবই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তিনি দেখিতে পান ঐ আকাশের ঐ গ্রহ উহাকে টানিতেছে, এ উহার সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়াছে, এ উহার বিরহে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, ও উহাকে না দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। বৈজ্ঞানিক আনন্দে তাঁহার ভাণ্ডার রত্নপূর্ণ করিতেছেন। সংসারে তাঁহার দুর্জ্ঞেয় কিছুই নাই। তবে উষা কোথায় তাহাই বা দুর্জ্ঞেয় থাকিবে কেন? শুনিলে বিস্মিত হইবে, দেখিলে বিশ্বাস করিবে না, উষা সুধীরের কাছে!! হাঁসিয়া উড়াইয়া দিওনা, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চলিয়া যাইওনা, শুন,দাঁড়াও,গ্রন্থকার পাগল নহে।

তুমি গ্রহে গ্রহে মিল দেখিতে পাও, চাঁদে সমুদ্রে সম্বন্ধ দেখিতে পাও, লৌহ চুম্বকে ভালবাসা দেখিতে পাও, আর প্রাণে প্রাণে একটা মিলের কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠিবে কেন? এই চন্দ্র আপনার গৃহে বসিয়া ঐ কত যোজনের বুধগ্রহকে যদি আকর্ষণ করিতে পারে, আর সেই টানের বলে যদি বুধকেও বিচলিত হইতে হয়, তবে এই

যে সুধীরের প্রাণ উষাকে এত করিয়া টানিতেছে, উষা নিকটে নাই বলিয়া কি উষা বিচলিত হইবে না? সুধীরের প্রাণ উষার দিকে তাকাইয়া এত কান্না কাঁদিতেছে, উষার প্রাণ তাহাতে ছট্ ফট্ করিবে না? এখন হে পাঠকপাঠিকাগণ। আপনাদের ভিতর যদি কেহ প্রেমিক প্রেমিকা থাকেন, তবে এ গ্রন্থকারকে মাপ করিবেন। গ্রন্থকার বড় অরসিক। একটা মোটা দৃষ্টান্তে এতবড় কথাটা বুঁঝাইযা দিতে চাহিল,—উঃ কি ধৃষ্টতা!।। তা যাক্ এ অসম্বদ্ধ-প্রলাপীর চিরনির্বাসনের আজ্ঞা দিযা এইখানেই এ পুস্তক পাঠ বন্ধ করুন। আমিও নির্ভাবনায় গিয়া দেখি আমার উষা কোথায়?

ঐ নীলগিরির পশ্চিম গায়ে মহারাজ মানসিংহের তাম্বু পড়িয়াছে। সঙ্গে দশ সহস্র মাত্র সৈন্য। এক একটী সৈন্য এক একটী সেনাপতি বিশেষ। সুতরাং মানসিংহ নির্ভয়। হিন্দুকুলচূড়ামণি মহারাজ মানসিংহ পরম আতিথেয়। জগচ্চন্দ্র রায়ের ন্যায় অতিথি পাইযা তিনি পরম আনন্দিত। জগচ্চন্দ্র, জগদীশ্বর, হৃষীকেশ তাঁহার সদ্-ব্যবহারে পরম প্রীত। মানসিংহ তাঁহাদিগের চরিত্রে, নিপুণতায, প্রখরতায, পরম আপ্যায়িত। মানসিংহ পাটনা হইতে ইহাঁদিগকে পাইয়াছেন। হৃষীকেশ প্রভৃতি আকবরের নিকট যাইযা যাহা পাইবার আশা করিযাছিলেন, মানসিংহেব নিকট তাঁহারা তাহা সম্পূর্ণরূপে পাইতে লাগিলেন। মানসিংহও তাঁহাদিগকে পাইয়া বাঙ্গালার সমস্ত সংবাদ একে একে জানিতে পারিলেন। হৃষীকেশের মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। মানসিংহ তাঁহাদিগের জন্য একটী প্রকাণ্ড তাম্বু ছাডিয়া দিয়াছেন। লোক জনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। পথে তাঁহাদের কোন ক্লেশ নাই। এইরূপে পাটনা হইতে বরাবর সোজা পথে নীলগিরি আসিয়াছেন। ইহা পার হইলেই উড়িষ্যা।। মানসিংহ, হিন্দুরাজা মুকুন্দদেবের জন্ত চিন্তিত। সুলেমানকে দূর

করিবার জন্য ব্যাকুল। পথে বিলম্ব করিতেছেন না। বড় তাড়া-তাড়ি আসিতেছেন। আজ এখান হইতে ছাউনি উঠাইতেন, কিন্তু গত দিবসের ঝড় বৃষ্টিতে কিছু বে-বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে, তাই আজ তাহার শৃঙ্খলা করিতেছেন।

তাম্বু পৃথক্ পৃথক্ পড়িয়াছে। জগচ্চন্দ্রদিগের তাম্বু কিছু তফাতে। সঙ্গে স্ত্রীলোক তাই মানসিংহ উহা এ জনসমর্দ্দের অন্তরেই রাখিতে বলিতেন। প্রহরার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন সুতরাং তাহাতেও কোন ভয় থাকিতনা। প্রহরীরাও তাঁহাদিগকে বড় মান্য করিয়া চলিত। মানসিংহের এমনিই আতিথেয়তা।

তাম্বুতে অনেক কুঠারী। তাহার একটীতে উষা বসিয়া রহিয়াছে। কাছে কেহ নাই। অনেকক্ষণ হইতেই নাই। উষা আজ বড় আকুল। রোজই তাই, তবে আজ যেন কিছু বেশী। উষা বুঝিতে পারিতেছে না, আজ কেন এমন হইতেছে? কেমন করিয়াই বা বুঝিবে? ইহা ত' বুঝিবার নহে,ভাবিবার,ব্যাকুল হইবার,মৃগনাভীগন্ধে মৃগের ন্যায় শুধু ছুটিয়া বেড়াইবার, স্বপনের সুখের ন্যায় শুধু মোহের,জ্ঞানের নহে। কেহই ইহা বুঝিতে পারেনা। বালিকা উষা তাহা বুঝিবে কেমন করিয়া? একদিন রাজা দুষ্মন্তও ইহা বুঝিতে পারেন নাই। সসাগরা ধরার অধীশ্বর, অতুলনীয় জ্ঞানের আকর, মহারাজাধিরাজ দুষ্মন্তও একদিন এইখানে অন্ধ হইয়াছিলেন। জানিতে পারেন নাই, বুঝিতে পারেন নাই, রাজপ্রাসাদে থাকিয়াও, সুখসাগরের তরঙ্গের পর তরঙ্গের উপর নাচিয়া বেড়িয়াও, দুষ্মন্তও একদিন একটী গান শুনিয়া বুঝিতে পারেন নাই, কেন তাঁহার সে সুখনিমজ্জিত মর্ম্ম দুঃখে কাতর হইয়াছিল? চিত্তীর ব্যাকুল হইয়াছিল? বুঝিতে পারেন নাই, কে কোথায় কতদূরে কোন নিভৃতে বসিয়া তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিতেছে? দুষ্মন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, ঐ সুদূর হিমা-

স্ত্রির পদপ্রান্তে ঐ শ্বেতোপলখণ্ডসঞ্চারিণী ফেনোদ্‌গারিণী ঝঙ্কারকারিণী শুভ্রমূর্ত্তি মালিনীর তটভূমিতে, ঐ কুটীরে বসিয়া কে তাঁহার প্রাণে গ্রথিত হইয়া এই যে হস্তিনার দ্বার পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে। দুষ্মন্ত আকুল। শাপবিমোহিত দুষ্মন্ত আঁধারে নিমজ্জিত। তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রাণ তাহা শুনিবে কেন? সে বাজিয়া উঠিল, বলিল,——

> রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
> পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোপি জন্তুঃ।
> তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
> ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।।

দুষ্মন্তেরও যখন এই অবস্থা, তখন বালিকা উষা তাহা কেমন করিয়া বুঝিয়া উঠিবে যে তাহার প্রাণ আজ কেন এমন হইয়া উঠিল? উষা চেতনা হারাইল। মূর্চ্ছা নহে, কিন্তু উষা অচৈতন্য। ঐ সম্মুখাগত দুর্ব্বাসার বজ্রনাদিনী অভিসম্পাত বাণী যাহার কর্ণগোচর হয় নাই, সেই কুটীরবাসিনী ঋষিকন্যার ন্যায় উষা আজ অজ্ঞান হইয়া পড়িল। রাজা শাপগ্রস্ত। তাঁহার প্রাণ ছট্ ফট্ করিলেও স্মৃতি অবরুদ্ধ। উষা তাহা নহে। উষা দেখিতে পাইল,ঐ সুধীর। ঐ সুধীর আমায় ডাকিতেছে। কিন্তু কই? কোথায়? আমি কোন দিকে যাইব? কোথায় যাইলে তোমার দেখা পাইব? সুধীর। সুধীর। প্রাণেশ। কই? কোথায়? ছুটিতে ছুটিতে উষার প্রাণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। উষা অন্ধকার দেখিল। হা বিধাতঃ। আমায় অভিসম্পাত কর, আমার স্মৃতির উপর বজ্রাঘাত কর। উষা শিহরিয়া উঠিল, ভাবিল, ছি! আমি মরিনা কেন?

সন্ধ্যা আসিয়া উষার হাত ধরিল। উষা কাঁদিয়া ফেলিল।

———

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেখ, তোমায় এত করিয়া সাধিলাম, এত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তবু তুমি কে তাহা আমায় বলিলে না? তুমি চলিয়া গেলে। আমি কি তোমায় ধরিয়া রাখিতে পারিতাম না? পারিতাম, কিন্তু তাহা পশুর কাজ, আমি তাহা করিলাম না। সেদিন ভদ্রকনদীতীরে চন্দ্রালোকে তোমাকে ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই, কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই যেন আর কি শুনিতে পাইয়াছিলাম, সে স্বর যেন তোমার নহে, যেন আর কাহার। আমি ব্যস্ত হইয়া তোমার পরিচয় চাহিয়াছিলাম তুমি যা হয় একটা বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলে। কি ভাবিয়া চলিয়া গিয়াছিলে জানি না। আমি কিন্তু মনে মনে আর একদিন তোমায় দিবালোকে দেখিবার সাধ করিয়াছিলাম। আজ তুমি তাহা পূর্ণ করিয়াছ। কিন্তু তোমায় দেখিয়া আমি যে বড় গোলে পড়িলাম, তুমি যে তুমি নহ, তোমায় দেখিয়া যে আমার বোধ হইল তুমি ভিখারিণী নহ। তবে তুমি কে? এত করিয়া ভিক্ষা করিলাম, ভিখারিণী হইয়া ভিক্ষার মর্ম্ম বুঝিলে না? বলিলে না যে তুমি কে? "ভিখারিণী" বলিয়া আবার আমায় প্রতারণা করিয়া চলিয়া গেলে? তুমি ভিখারিণী তাহাতে আর সন্দেহ কি? তুমি গৈরিক বসন পরিয়াছ, হাতে গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ধরিয়াছ, মস্তক মুণ্ডিত করিয়াছ, সীমন্তনিম্নে মাটির ফোঁটা কাটিয়াছ। আমি হিন্দুর সব জানি, তুমি হিন্দুর সন্ন্যাসিনী

ভিখারিণী বটে। কিন্তু মনের কথা আর চাপিলে কি হইবে? অসম্ভব বলিয়া কতবার তোমায় ভিখারিণী বলিয়াই স্থির করিতে যাইতেছি, কিন্তু পারিতেছি কই? ভাবি কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর ঐ অতটুকু চন্দ্ররেখা দেখিয়া তাহার চারি পার্শ্বে পৌর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্রের রেখা খুঁজিয়া বেড়াইতেছি কেন? আমার একটী ফুল আছে, নবনবনীততুল্য তাহার কান্তি, অম্লান গৌরোজ্জ্বলা দীপ্তি, জীবনসঞ্চারিণী মধুরতা, তোমাকে দেখিয়া তাহার মলিন ছায়া আমার চক্ষের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? কেমন করিয়া জানিব কেন? মনে হয় এই শিরে যদি কেশরাশি তরঙ্গায়িত হইত, এই ললাটে যদি অলকাবলী উথলিয়া পড়িত, এই নয়ন যদি কজ্জলসূত্রে আবদ্ধ হইত, এই অধর যদি তাম্বূলরাগে রঞ্জিত হইত, তবে যে তাহাই হইত। তাই কি? ভিখারিণি! তুমি কে?

রাজু, প্রান্তরের ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছে।

হায় রাজু! তুমি রূপে অন্ধ, রূপজমোহে আত্মহারা, তুমি রূপের মন্দিরে আত্মবলি দিয়াছ, তুমি সংসারে আসিয়া আর ত' কিছুই চিনিতে পারিবে না। তুমি চিনিবে কেমন করিয়া যে সেই রূপের আধার চামেলী এই এমন কুরূপা হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছে? তুমি রূপ চেন, রূপসী চেন না। তুমি এ চামেলীকে চিনিবে কেমন করিয়া? এ যে শীতবায়ুসংমূর্চ্ছিতা শীর্ণা বিকৃতবেশা সৌন্দর্য্য-বিরহিতা মাধবীলতা। ইহা যে বসন্তবাত্যান্দোলিতা পুষ্পস্তবকাবনম্রা সুখদর্শনা মোহিনী রসময়ী ভাবময়ী পল্লব-করনর্ত্তিনী নহে, তুমি ইহাকে চিনিবে কেমন করিয়া? তুমি সৌন্দর্য্যের দাস, শুধু জাকজমকে বিমোহিত। তুমি বর্ষার জলভরা নিমজ্জিততটা কুমুদকহ্লারবিশোভিনী সরসীর অগাধজলে নিমজ্জিত হইতে শিখিয়াছ। তুমি শীর্ণশরীরা বিশুষ্কসলিলা সরসীর এ পরিমিতজলে ডুবিবে কেমন করিয়া? পারিবে না? এ যে শীতল, এ যে স্বচ্ছ, এ যে তলস্পর্শী,

ইহার অন্তরের যে তল আছে। এই আমি, এই আমার সব, এই দেখ আমার হৃদয়,আমার কুমুদ নাই,আমার কহ্লার নাই,আমার কিছুই নাই আমার যাহা আছে এই সব তোমায় দেখাইতেছি। তোমার কাছে আমার লুকাইবার কিছুই নাই, তোমায় ভুলাইবারও কোন উপকরণ নাই, দেখ এই আমি, এই আমাব সব, এখন হে আমার তুমি! এস আমাব বুকের উপব পা দেও। বাজু! তুমি এ প্রাণখোলা আদরের এ হৃদয়ভরা সৌন্দর্য্যেব মহিমা জ্ঞানে বিমূঢ়। তোমার সে চক্ষু নাই— যে চক্ষে চন্দ্রের কলঙ্ক সুন্দর, শৈবালমালায় সরসিজ মনোহর, ভ্রমবরুদ্ধ জলদ-অঙ্কে বিদ্যুল্লতা চমৎকারিণী, তোমার সে রূপবিমর্শিনী অন্তর্দর্শিনী প্রীতিময়ী দৃষ্টি নাই। তোমাব দৃষ্টি শুধু রূপে—শুধু আলোয়—শুধু বিদ্যুতে—ঝলসিত। তুমি দহ্যমান কাষ্ঠ, তোমার চারিদিকে অগ্নিশিখা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, তুমি পুড়িতেছ, এখনও পুড়িয়া যাও নাই, তোমার অঙ্গ এখনও কোথাও একটু অঙ্গার হয় নাই, তুমি কেমন করিয়া জানিবে, পুড়িবার পর কি হইতে হয়? কেমন করিয়া জানিবে এই জ্বালামালাসঙ্কুল দেহ পুড়িয়া মসীবিনিন্দী ঘোর কৃষ্ণ অঙ্গার হইয়া যায়? আর সেই কালো অঙ্গাবের পার্শ্বে ঐ যে অনূর্দ্ধ-প্রসারিণী, শুধু দেহবিজড়িত প্রদীপ্ত অনলেব স্নিগ্ধোজ্জ্বলা কান্তি, তাহা হে জলন্ত! তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে?

বাজু কিছুই স্থির কবিতে পারিল না। কেবল ঐ সহজসমাগত বাত্যাসঞ্চালনে উর্দ্ধ-প্রসারিণী বহ্নিশিখার ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। চামেলী-পতঙ্গ কেবল তাহার ভিতরে পড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সে আগুনে কোথাও একটু দাগও পড়িল না। সে তেমনিই জ্বলিতে লাগিল।

অদূরেই তাম্বু, রাজু ভাবিল,—আমি কি করিতেছি? কিসে কি ভাবিতেছি? তাহাও কি সম্ভব? যাজপুরের নিকটে আসিয়াছি;

সময় নিকট হইয়া আসিয়াছে, এখন এমন করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? যাই আজ বৈতরিণীর তীরে ছাউনি করিতে হইবে। ভাবিয়া রাজু তাম্বু অভিমুখে যাইতে লাগিল।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে মুকুন্দদেব শুনিলেন বিশালায় আসিয়া সুলেমান ছাউনি করিয়াছে। বিশালা যাজপুরের পাঁচক্রোশ পূর্ব্বে নদীর উত্তর তটে। তখন স্থির করিলেন পাঠানেরা সেখান হইতে নির্ব্বিঘ্নে নদীপার হইয়া নগর আক্রমণ করিবে। তাহা হইবেনা, মুকুন্দদেব তৎক্ষণাৎ পুত্র গৌড়িয়া গোবিন্দকে নগররক্ষার ভার দিয়া আপনি সসৈন্যে বিশালার অপর পারে যাইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। যখন সমুদয় শত্রু বিশালায় সমবেত তখন মুকুন্দদেব ভাবিলেন উহার প্রতীকারের জন্য এইখানেই বিশেষ উদ্যোগী হইতে হইবে। তিনি নগরে সামান্য মাত্র সৈন্য রাখিয়া বিশালার অপর পারে আসিয়া জমকাইয়া বসিলেন। মুকুন্দদেবের ভাগ্যলক্ষ্মী এই খানেই মুকুন্দদেবের চক্ষু আবৃত করিলেন। মুকুন্দদেব এই খানেই বড় রকম একটা ভুল করিয়া ফেলিলেন।

ওদিকে সুলেমান দেখিলেন এরূপে হইবে না। নদীপার হইতে না পারিলে বিজয়ের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এ প্রবল শত্রুর সম্মুখে নদী পারত' হওয়া যাইবেনা। সুলেমান ভাবিলেন,—সোজাপথে হইবে না, একটা চাল চালিতে হইবে। হিন্দু আমাদিগকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতে গিয়া যে চাল চালিতে গিয়াছিল, তাহার একটা ভাল রকমের জবাব দিতে হইবে। তখন খানজামান ও কালাপাহাড়ের সহিত একটা পরামর্শ আটিলেন। উভয়েই সম্মত হইল। সুলেমান তখন হুকুম দিলেন,—যুদ্ধ হইবে না, সন্ধি করিতে হইবে। এখনি সাদা নিশান উড়াও।

তাহাই হইল। সন্ধির চিহ্ন সাদা নিশান সুলেমানের তাম্বুর উপর সমুত্থিত হইল।

মুকুন্দদেব দেখিলেন এ কি! পাঠান যুদ্ধ করিবে না, সন্ধি করিতে চায়! মুকুন্দদেবের অন্তঃকরণে কিছু আত্মগরিমার ছায়া পড়িল। মুকুন্দদেব ভাবিলেন এতদূব সাজিয়া গুজিযা আসিয়া বিনা যুদ্ধে যে সন্ধি করিতে চায় পরাজয় ত' তাহারই। বিনা রক্তপাতে যুদ্ধে জয় ইহাত' আমার পরম মঙ্গল।

মুকুন্দদেবের দুরদৃষ্ট, এইখানে মুকুন্দদেব নীতিশাস্ত্র ভুলিয়া গেলেন। বিশ্বস্তমনে মুকুন্দদেবও সাদা নিশান উডাইতে হুকুম দিলেন।

বিশালার ঘাট হইতে সাদা নিশান উডাইয়া একখানি নৌকা মুকুন্দদেবের ছাউনীর অভিমুখে আসিতে লাগিল।

মুকুন্দদেব হুকুম দিলেন,—দূতকে বিশেষরূপে সম্মান করিও।

যথাসময়ে দূত আসিয়া মুকুন্দদেবকে সেলাম করিলেন। মুকুন্দদেব পরম সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

পরস্পরের আদর অভ্যর্থনার পর স্থির হইল সন্ধিই হউক। তবে সন্ধির সর্ত্ত লইয়া উভয়ের কিছু মতভেদ হইল।

দূত মহারাজের আপত্তির কথা সুলেমানের নিকট বলিবার জন্য ফিরিযা আসিলেন।

এইরূপে দুই একদিন কথায কথায কাটিয়া যাইতে লাগিল।

মুকুন্দদেব পথ আগুলিযা কতক নিশ্চিন্তে সেই খানেই বসিয়া রহিলেন।

সন্ধির কথাই চলিতে লাগিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ওদিকে সুলেমান দেখিলেন ঠিক্ হইযাছে। হিন্দু নীতি ভুলিয়াছে। এখন পরামর্শমত কার্য্য হইতে থাকুক্।

তাহাই হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, সংসার নিস্তব্ধ, কালাপাহাড অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন। পাঠানবাহিনীর অর্দ্ধেক তাঁহাব সহিত চলিত লাগিল। কালাপাহাড় সেই সৈন্যসাগর লইযা প্রান্তরে প্রান্তরে বরাবর পশ্চিমমুখী হইয়া যাজপুরের দিকে চলিতে লাগিলেন।

আর অর্দ্ধেক রহিল ছাউনীতে। কালাপাহাডের যাজপুরপ্রবেশের সংবাদ পাইলেই এই বাহিনী লইয়া স্বয়ং সুলেমান মুকুন্দদেবকে আক্রমণ করিবেন।

মুকুন্দদেব বেশ্ বিশ্বস্ত। একেবারে নিশ্চিন্ত না হইলেও কিছু শিথিলপ্রযত্ন বটে। সৈন্যদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবার অনুমতি দিলেও সৈন্যেরাও কিছু নিরুদ্যম। যুদ্ধত' আর হইবে না, তবে শত্রু সম্মুখে, তা একেবারে নিদ্রিত না থাকিলেই হইল। এইত' কদিন কাটিয়া গেল কোন উপদ্রব ত' দেখিলাম না সুতরাং সন্ধি নিশ্চিতই তাই সৈন্যেরাও কিছু নিশ্চিন্ত।

নীতিনিপুণ সুলেমানের তীক্ষ্ণদৃষ্টির কাছে মুকুন্দদেবের শক্তির এ অবস্থা অবিদিত রহিল না। এ পরামর্শ পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছে এখন

তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে সুলেমান দৃঢ়সঙ্কল্প। পরামর্শটা এই,—কালাপাহাড় অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া চুপে চুপে গিয়া নগর আক্রমণ করিবেন, কেননা আমরা এই বিশালায় উপস্থিত থাকায় মুকুন্দদেব বিপুলবলে আমাদিগকে নিবারণ করিতে নগর ছাড়িয়া এই এতদূরে অবস্থিত, নগরে বল কম, তাহার উপর সন্ধি-স্থাপন হইবে মুকুন্দদেবের পুত্রও সে সংবাদ পাইয়াছেন, সুতরাং তিনিও নিশ্চিন্ত, অতএব কালাপাহাড়ের নগর আক্রমণ করা অসহজ নহে। আর অর্দ্ধেক বল লইয়া আমি এখান হইতে চুপে চুপে নদী পার হইয়া মুকুন্দদেবকে আক্রমণ করিব, সুতরাং মুকুন্দদেবও সহজে নগর রক্ষার্থে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। এমত ক্ষেত্রে আমাদের জয় নিশ্চয়। এখন রাতারাতি এ কার্য্যটা সম্পন্ন করিতে পারিলে হয়।

সুলেমান কালাপাহাড়ের পৌছান সংবাদের জন্য উৎসুক রহিলেন।

মোটে পাঁচক্রোশ পথ, সৈনিকের কাছে তাহা কতটুকু? এক জন অশ্বারোহী আসিয়া সুলেমানকে বলিল কালাপাহাড় বিনা বাধায় সৈন্যসমেত নদীপার হইয়া নগরে প্রবেশ করিয়াছেন।

সুলেমান হর্ষোৎফুল্লনেত্রে সৈন্যদিগকে ইঙ্গিত করিলেন। তখনি চুপে চুপে সকলে নৌকা পুরিয়া নদীপার হইতে লাগিল। ঠিক্ সম্মুখে নহে কিছু তফাতে যাইয়া নৌকা ভিড়িতে লাগিল, আর পিপীলিকাশ্রেণীর মত সৈন্যশ্রেণী সারি গাঁথিয়া অপরপারে সজ্জিত হইতে লাগিল। কতক অগ্রে কতক পশ্চাতে মুকুন্দদেবের ছাউনি যবনসেনার মধ্যবর্ত্তী। মুকুন্দদেব এ যাবৎ ইহার কিছুই সংবাদ পাইলেন না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"ক্রুম্ ক্রুম্ ক্রুম্" মুকুন্দদেবের তন্দ্রা ভাঙ্গিল। এ অকস্মাৎ কামান গর্জ্জনে মুকুন্দদেব বিস্মিত হইলেন। ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন বিপদ্ সমূহ! মুসলমানসেনা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। মুকুন্দদেব বুঝিলেন সন্ধি ছল মাত্র। এইরূপে আমাকে পরাজিত করিবে বলিয়াই সুলেমান সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিল। মুকুন্দদেব মনে মনে আপনাকে সহস্রবার ধিক্কার দিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—আমি রাজা, রাজা হইয়া এই টুকু বুঝিতে পারি নাই, ধিক্ আমায়!!!

মুকুন্দদেব একেবারে বাহিরে আসিলেন। যেখানে তাঁহার সৈন্যেরা পড়িয়া মার খাইতেছে, একেবারে সেইখানেই আসিলেন। দেখিলেন,—তাঁহার সৈন্যেরা একেবারে ছোড়ভঙ্গ। ইহার হাথিয়ার নাই, উহার বন্দুক নাই, এ এখানে, ও সেখানে, একেবারে শৃঙ্খলা নাই। এ উহার দোষ দিতেছে, ও ইহার দোষ দিতেছে। সৈন্য মধ্যে মহা গোলমাল।

মুকুন্দদেব ভাবিলেন,—ইহাই ত' হইবে। এই সময়েই ত' আপনা আপনি বিবাদ বিসংবাদ হইবে। নহিলে অধঃপাতে যাইব কেমন করিয়া?

মুকুন্দদেব একেবারে সৈন্যমণ্ডলীর মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে অভিবাদন করিল। একটু গোলও থামিয়া গেল।

তখন মুকুন্দদেব বলিলেন,—এ অভিবাদনের সময় নয়। এখন অভিবাদন রাখ। দেখিতেছ সম্মুখে এ কি বিপদ্। আমিই এ বিপদের মূল, শত্রুকে বিশ্বাস করিয়া, শত্রুর কথায় ভুলিয়া, আমিই এই বিপদ্কে সাদরে আহ্বান করিয়াছি। আমি মূর্খ। আমারই নির্বুদ্ধিতায় তোমরা বিশ্রব্ধ ছিলে, তাই আজ এমন করিয়া তোমাদিগকে মরিতে হইতেছে। আমি এ ঘোর পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিব, আমি একাকী এ বিপক্ষসৈন্যের ব্যূহ ভেদ করিয়া বৈতরণীর স্রোতে আপনার রক্তস্রোত প্রবাহিত করিব।

দৃপ্তসিংহের ন্যায় মুকুন্দদেব গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

সৈন্যেরা তখন সকল ভুলিয়া "জয় মহারাজের জয়" "জয় বিরজা মাতার জয়" বলিয়া লাফাইয়া উঠিল।

এক মুহূর্ত্তে যেন সকল বিশৃঙ্খলা ঘুচিয়া গেল। আসমান হইতে যেন হাথিয়ার বন্দুকের বৃষ্টি হইতে লাগিল। এক মুহূর্ত্তে সকলে সজ্জিত হইয়া পড়িল।

তখনও রাত্রি আছে, বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। মুকুন্দদেব দেখিলেন,—শত্রু বেশী নহে। মুকুন্দদেব জানেন না যে তাঁহার বিপদের উপর বিপদ্ উপস্থিত, তিনি জানেন না যে তিনি শত্রুতে বেষ্টিত, তিনি জানেন না যে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে খানজামান ওত করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। মুকুন্দদেব সম্মুখে মুসলমানের সহিত লড়াই করিয়া কিছু পরিশ্রান্ত হইলেই পশ্চাৎ হইতে খানজামান তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। মুকুন্দদেব ইহার কিছুই জানেন না। তিনি জ্যোৎস্নালোকে শত্রুর সংখ্যা কম দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইলেন ও সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিলেন।

তখন ভীমবেগে হিন্দুসেনা যবনসেনাকে আক্রমণ করিল।

মুকুন্দদেব স্বয়ং কামান দাগিতে লাগিলেন। শত শত যবন ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

পাঠানকে একটু হটিতে হইল। তখন জল স্থল কম্পিত করিয়া হিন্দুসেনা পাঠানের উপর লাফাইয়া পড়িল। পাঠান ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িল।

সুলেমান প্রমাদ গণিলেন। তিনি মুকুন্দদেবকে চিনিতেন। আজ আবার ভাল করিয়া চিনিতে পারিলেন। সুলেমান আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারেন না দেখিয়া খানজামানকে সঙ্কেত করিলেন। সুলেমান সজোরে একটী বাঁশী বাজাইলেন।

খানজামান উৎকর্ণ ছিলেন বাঁশীর শব্দ পাইয়াই ব্যাঘ্রের মত পশ্চাৎ হইতে মুকুন্দদেবকে আক্রমণ করিলেন।

মুকুন্দদেব পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

দুই দিক্ হইতে আক্রান্ত হইযা তাঁহার সৈন্যেরা সব কাতর হইয়া পড়িল।

মুকুন্দদেব আপনাব সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত কবিতে না করিতে খানজামান আসিয়া তাঁহার ছাউনি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন।

মুকুন্দদেবের সৈন্য সব বিক্ষিপ্ত হইযা পডিল। দুই দিক্ হইতে ঘন ঘন কামানের শত শত গোলা আসিযা মুকুন্দদেবেব সৈন্যরাশি ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

মুকুন্দদেব ভীমবেগে শত্রুসৈন্যমধ্যে ঝাঁপ দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার আর সন্ধান পাওয়া গেলনা।
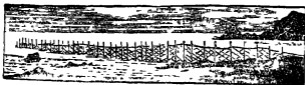
দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আর গোবিন্দদেব। দুর্গমধ্যে অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াও গোবিন্দদেব আজ নিশ্চিন্ত। সুলেমান সন্ধি করিতেছে তবে আর চিন্তা কি?

চিন্তা কিছুই নহে, কিন্তু এ কি! শত্রু বিশালায়, শত্রু সন্ধি করিতেছে, তবে ঘোরনিশীথে ঐ অদূরে এত কোলাহল কিসের?

গোবিন্দদেব নিদ্রা যাইতে ছিলেন। হঠাৎ বড় একটা গোল মালে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চমকিত হইয়া স্থিরভাবে শুনিতে লাগিলেন। শুনিলেন,—পাঠানবাহিনীর জয়ধ্বনি।

তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে পাঠান আসিয়া তাঁহার নগর আক্রমণ করিয়াছে।

গোবিন্দদেব লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরে আসিয়া প্রতীহারীকে এক পদাঘাত করিলেন, সে তখনও ঘুমাইতেছিল।

গোবিন্দদেব একেবারে বাহিরে আসিলেন। তখন বেশ বুঝিতে পরিলেন পাঠান একেবারে প্রায় দুর্গদ্বারে।

সর্দার রামকুমার আসিয়া অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। বলিল,——

যুবরাজ! একেবারে অতর্কিতভাবে পাঠান আসিয়া নগর আক্রমণ করিয়াছে। আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। সন্ধি হইবে সুতরাং কিছু শিথিলতাও আসিয়াছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা

ভুল। কিন্তু এ সব এখন ভাবিবার সময় নহে, শত্রু যখন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন অনুমতি করুন আমরা সজ্জিত হইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করি।

গোবিন্দদেব বলিলেন, তাহাই হউক। কিন্তু এ যুদ্ধেত' আমাদের পরাজয় নিশ্চয়ই, কেননা আমরা অপ্রস্তুত, তাহার উপর আবার উহাদের অপেক্ষায় সংখ্যায় অনেক কম। কিন্তু তাহা বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইতে বলিনা। তুমি যাও, পাঠান এখনও দুর্গের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। এইবেলা সজ্জিত হও। আমি এই দুর্গের প্রাচীরে উঠিয়া উহাদের একবার দেখিয়া আসি।

সর্দার তীরের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল। গোবিন্দদেব একাকী দুর্গপ্রাচীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আঘাতের পর আঘাত করিতে করিতে বেলাভূমে সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় মুকুন্দদেব পাঠানসৈন্যশ্রেণী আসিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন ক্রমেই তাহারা অবাধে দুর্গের দিকে আসিতেছে।

গোবিন্দদেব দেখিলেন অসাধ্য। এতলোকের সহিত আমাদের এই মুষ্টিমেয় লোকে কি করিতে পারিবে? কিন্তু এ কিরূপ হইল? বিশালা হইতে ইহারা চলিয়া আসিল, মহারাজ কি ইহার কিছুই সংবাদ পান নাই?

গোবিন্দদেব একবার চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেন। তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে। অষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্র আসিয়া আকাশে দেখা দিয়াছেন। গোবিন্দদেব সেই সমুজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিলেন, কতকগুলি সৈন্য একজন মাত্র সেনাপতির অধীনে আসিয়াছে। বুঝিলেন মহারাজেরও বিপদ ঘটিয়াছে। ইহারা এই নীতি অবলম্বন করিবে বলিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিল। গোবিন্দদেব হাত কামড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু এখন আর উপায় নাই।

গোবিন্দদেব ভাবিলেন,—মরিতেত’ হইবেই, কিন্তু একি হইল? বিরজাদেবীকে রক্ষা করিতে পারিলাম না? গোবিন্দদেবের চক্ষে জল আসিল। তিনি আপনাদিগের নির্বুদ্ধিতায় অধীর হইলেন। কি করিব, কি করিলে ইহার প্রতীকার হইবে, কি কবিলে বিরজামূর্ত্তির রক্ষা করিতে পারিব, গোবিন্দদেব ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন।

এমনসময়ে ও কে? গোবিন্দদেব দেখিলেন,—ঐ দুর্গপ্রাচীরের উপর দিয়া কে এক জন তাঁহার দিকেই আসিতেছে। গোবিন্দদেব বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন শত্রু। গোবিন্দদেব বন্দুক উন্নত করিযা তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেন।

তখন যেখানে চন্দ্রালোক আসিয়া পড়িয়াছিল লোকটী আসিযা সেইখানে একবার দাঁড়াইল।

গোবিন্দদেব তাহা দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন লোকটী নিবস্ত্র। গোবিন্দদেব বন্দুক নামাইলেন।

যে আসিতেছিল সে আবার অগ্রসর হইতে লাগিল। গোবিন্দ-দেব তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দদেব দেখিলেন,—এক জন সন্ন্যাসী আসিতেছেন। ভাবি-লেন,এ আবার কি? গোবিন্দদেব দৃঢ়মুষ্টিতে হাতিযার ধরিলেন। সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গোবিন্দদেব দেখিলেন সন্ন্যাসীই বটে। চিনিলেন, প্রণাম কবিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—রাজপুত্র! শত্রু আশঙ্কা করিয়াছিলেন? করি-বারই কথা। তা যাক্, এখন কি করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন?

গোবিন্দদেব বলিলেন,—আপনি আমাদের পরম শুভানুধ্যায়ী, এই কয় দিন ধরিয়া আপনার নিকট পরিচিত হইয়া আপনা আপনি কৃতার্থ হইয়াছি। আপনি এত করিয়া মাতৃদেবীর অর্চ্চনা করিলেন, কিন্তু দেখিতেছি কোন ফলোদয় হইল না। রাজ্যসম্পদ অতি তুচ্ছ,

তাহার জন্য বলিতেছি না। আমরা যে মাতৃমূর্ত্তির রক্ষা করিতে পারিলাম না ইহাই জীবন্তে নরকযন্ত্রণা। এ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিব না। মনে করিয়াছি সে বিপৎপাতের পূর্ব্বে শত্রুরক্ত-স্রোতে আপনার রক্ত-স্রোত মিশাইয়া দিব। তা যাক্ এখন আপনি এখানে কেমন করিয়া আসিলেন? আর কেনই বা এই বিপদসঙ্কুল সময়ে এখানে আসিলেন?

সন্ন্যাসী বলিলেন,—সে কথা পরে বলিতেছি। আমি আপনারই অনুসন্ধানে এইখানে আসিয়াছি। আপনি যাহা বলিলেন তাহা আপনার মত বীরেরই উপযুক্ত। কিন্তু মায়ের উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই?

গোবিন্দদেব স্থিরদৃষ্টিতে একবার সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। বলিলেন,—শত্রুহুঙ্কারে বোধহয় আমার বুদ্ধির ভ্রম হইয়া থাকিবে।

সন্ন্যাসী কিছু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন যুদ্ধবীরের মত বিস্ময় বটে। কিন্তু সন্ন্যাসীর কমণ্ডলু কি এতই অসার?

গোবিন্দদেব একটু হাসিলেন। বলিলেন,—তাহাই হউক, দেখি আপনার কমণ্ডলুতে কত বল?

সন্ন্যাসী বলিলেন,—আমরা সন্ন্যাসী, সংসারের বিষম বল সহ্য করিতে না পারিয়াই সংসারত্যাগী, ইহাকে পলায়ন বলিলে বলিতে পারেন। কিন্তু আজ কথায় কথায় বলিয়া ফেলিতে হইল, সংসারই বুঝি আজ আমাদের পদদলিত। তা যাক্, এখন কথাটা এই। আমরা সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছি, কালাপাহাড় দুর্গজয় করিতে না করিতে আমরা মাতৃমূর্ত্তি লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইতে পারিব। শত্রু শূন্যমন্দির ধ্বংস করিয়া যাইবে।

গোবিন্দদেব আবার হাসিলেন। বলিলেন,—শত্রুমিত্রে যাঁহা-

দের সমজ্ঞান তাঁহারা সংসারে এইরূপ সরল পথেই যাইতে চান। কিন্তু কয় জন ব্রাহ্মণে এই নবীন ধর্ম্মোন্মত্ত যুদ্ধবীরকে ফাঁকি দিতে চান? হিন্দুর দেবতানাশই যে তাহার যুদ্ধফল, ইহা কি আপনারা জানেন না?

সন্ন্যাসী। জানি বলিয়াই ত' আপনার নিকট আসিয়াছি। নহিলে আমাদের সাধ্য কি যে ইহার কবল হইতে দেবতা রক্ষা করি?

গোবিন্দদেব বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,—ইহার অর্থ ত' কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আপনার অভিপ্রায় কি?

সন্ন্যাসী বলিলেন,—অভিপ্রায় আর কিছুই নহে। আপনি সশস্ত্রে আমাদের সঙ্গে চলুন, আর যে কিছু সৈন্য আপনার এই দুর্গমধ্যে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইতেছে তাহারাও আপনার অনুবর্ত্তী হউক।

গোবিন্দদেব বলিলেন,—তাহা হইলে কি হইবে?

সন্ন্যাসী বলিলেন,—তাহা হইলে আমরা নিরাপদে দেবীমূর্ত্তি রক্ষা করিতে পারিব। নহিলে বৃথা রক্তপাতে লাভ কি?

গোবিন্দদেব গম্ভীরমূর্ত্তি হইলেন। বলিলেন,—আমরা ক্ষুদ্র, সন্ন্যাসের মর্ম্ম বুঝি না, সন্ন্যাসী আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি পলায়ন করিতে পারিব না।

গোবিন্দদেব লোলদৃষ্টিতে শত্রুসৈন্যদিগকে দেখিতে লাগিলেন।

এবার সন্ন্যাসীও কিছু গম্ভীর হইলেন। সে চিরহাস্যময় মুখমণ্ডলে যেন কিসের একটা ছায়া পড়িল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—যুবরাজের কি ইচ্ছা মাতৃপ্রতিমা কালাপাহাড়ের পদতলে বিলুণ্ঠিত হউক।

কথাটা গোবিন্দদেবের প্রাণে গিয়া বাজিয়া উঠিল। ভাবিলেন,—তাই ত'? আমি যেন মরিলাম, কিন্তু তাহা হইলেই ত' শেষ হইবে না, ইহার যুদ্ধশেষ যে ঐ প্রতিমাধ্বংস। যদি তাহাই রক্ষা করিতে

না পারিলাম, তবে মরিয়া সুখ কি? তবে কি এই সন্ন্যাসীর পরামর্শই ঠিক্?

গোবিন্দদেব পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী দেখিলেন,—কথাটায় কিছু কাজ হইযাছে। ভাবিলেন,—জয মা। তোমাব উদ্ধাব তুমিই কব। এ বৃথা রক্তপাতেব পথ অবরুদ্ধ কর। বলিলেন,—গোবিন্দদেব। তুমি বীর, তুমি বুদ্ধিমান্, যুদ্ধবিষযে তোমায় উপদেশ দেওয়া সন্ন্যাসধর্ম্মীর অকর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি রাজপুত্র, তোমাব সূক্ষ্ম বিবেচনায আমাব উপদেশবাক্যের যাথার্থ্য অনুভূত হইতে পারিবে এমন ভবসা রাখি বলিযা তোমাব নিকট আসিয়াছি। আমি বলি কালাপাহাড কি করিতে আসিয়াছে? তোমার বাজ্য ধ্বংস করিয়া দেবদেবীব ধ্বংস করিবে, কালাপাহাডের ইহাই অভিপ্রায। আর তাহার সেই অভিপ্রায়ই যদি সিদ্ধ না হয়, তবে তাহাব পণ্ডশ্রম। তুমিই বলিযাছ। রাজ্য সম্পদ তুচ্ছ, তবে ইহাকে যাইতে দেও, ইহা শত্রুব অধিকৃত হউক। এখন যাহা সারাৎসার তাহা যদি কোনরূপে রক্ষা করা যায়, তবে তাহাতে অনুদ্যম কেন? তাঁহার বক্ষা করিতে যাওযাকে কাপুরুষতা বলি কেন? তাঁহার রক্ষাই যে এখন পরম পুরুষার্থ, ইহা না বুঝিতেছি কেন্? কৌশলে তাঁহার রক্ষা করিতে যাওয়া যদি পলায়ন হয় তবে যুদ্ধশাস্ত্র মিথ্যা, নীতি মিথ্যা। সন্ন্যাসধর্ম্মে থাকিয়া এ অল্পবুদ্ধিতে ইহাই ধারণা। জানিনা রাজবুদ্ধির গতি কিরূপ?

সন্ন্যাসী নীরব হইলেন।

গোবিন্দদেব অনেকক্ষণ পাদচারণা করিলেন। শত্রুসৈন্যের দিকে অনেকবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় পাঠানবাহিনী আসিয়া জমায়েত হইয়া পড়িতেছে। ভাবিলেন,—ইহা-

দিগকে দূর করা অসাধ্য। বলিলেন,—আপনার কথাই ঠিক্। কিন্তু যাওয়া যাবে কোথায়?

সন্ন্যাসীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। বলিলেন,—রাত্রি আর বড় বেশী নাই, কিন্তু এই রাত্রির মধ্যে নগরীর দক্ষিণপশ্চিমবর্ত্তী নীলগিরির নিবিড়জঙ্গলে প্রবেশ করিতে হইবে। পরে বনে বনে পুরুষোত্তমাভি-মুখে যাইতে হইবে।

গোবিন্দদেব শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন,— চোরের মত পলাইতে হইল!!!

সন্ন্যাসী বলিলেন,—পলায়ন মনে করিবেননা, ইহা দেবতার উদ্ধার। গোবিন্দদেব দ্বিরুক্তি করিলেন না।

তখন "ক্রম্ ক্রম্" করিয়া বিপক্ষের কামান গর্জ্জিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। আপনি নামিয়া আসুন এবং আপনার কোন অভিজ্ঞান আমায় দিন আমি সেনাপতির নিকট আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া সৈন্যসমেত দুর্গের গুপ্তদ্বারে গিয়া অপেক্ষা করি। আপনি অন্তঃপুরিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া সত্বর আমাদিগের সহিত মিলিত হউন। গোবিন্দদেব সন্ন্যাসীকে আপনার উষ্ণীষ প্রদান করিলেন।

সন্ন্যাসী দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

গোবিন্দদেব ভাবিলেন,—মা! তোমার ইচ্ছা। তিনি আর দাঁড়া-ইলেন না। সন্ন্যাসীর উপদেশমত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইযাছে। বিহঙ্গকুলেব কাকলীরবে আজিকাব এ প্রভাত সুখনিদ্রা হইতে সমুথিত নহে। কেবল চীৎকার, কেবল ক্রন্দন, কেবল হাহাকার। যাজপুবনগরীব আজিকাব এ প্রভাত বড় শোচনীয়।

রক্ষকহীন দুর্গ অবাধে অধিকৃত হইযা গিযাছে। কালাপাহাডের সৈন্যগণ নগর লুণ্ঠন করিতে আবম্ভ করিযাছে। নিরপবাধী নগর-বাসীরা হাহাকার কবিতেছে।

সপ্তমাতৃকাব মন্দিব ধুলিসাৎ হইল, বারাহীর হস্ত, কৌমাবীর পদ, নারসিংহীর মুখমণ্ডল কালাপাহাডের পদাঘাতে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।

দেবতাধ্বংসে উন্মত্ত কালাপাহাড়ের দলের জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল স্তম্ভিত হইযা পডিল। কালাপাহাড় উধাও হইয়া যে দিকে বিবজার মন্দির সেই দিকে ছুটিতে লাগিল। দুর্গদ্বারে কামান বন্দুক পড়িয়া রহিল। কালাপাহাড় দেবতানাশে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল।

এই অবকাশে নগরবাসীবা একটু সুযোগ পাইল। যে যেমন ছিল

যে যেখানে পারিল এই অবকাশে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু যাইবে কোথায়? কোন রকমে নদী পার হইয়া এ দেশ ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া তাহারা বৈতরিণীর তীরে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের প্রাণ একেবারে উড়িয়া গেল। জালমুক্ত হরিণ প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিতে যাইয়া যদি সম্মুখে আবার প্রসার্য্যমাণ বাগুরা দেখিতে পায়, তবে সে যেমন কি একরকম হইয়া যায়, এ পলাতক নগরবাসীরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বৈতরণীর তীরে আসিয়া তাহাই হইয়া পড়িল। এখানে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহারা চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। দেখিল বৈতরিণী ছাইয়া নৌকাশ্রেণী, আর তাহাতে শ্রেণীতে শ্রেণীতে মনুষ্যশ্রেণী। কি সর্ব্বনাশ! আবার শত্রু! ভগবান্ এ করিলে কি? যাহারা পলাইতেছিল হা হতোস্মি বলিয়া তাহারা সকলে বসিয়া পড়িল।

ক্রমে সেই অনন্ত নৌকাশ্রেণী আসিয়া তীরে লাগিল। পিপীলিকা-শ্রেণীর মত সেই মনুষ্যশ্রেণী বৈতরণীতীর আচ্ছন্ন করিল। সব নীরব। ঐ অত লোক, যেন কেহই নাই। নগরবাসীরা বিস্মিত হইল। ভাবিল এ কি? ইহারা এখনও আমাদিগকে মারিয়া ফেলিল না কেন?

তখন ঐ জনসম্মর্দ্দের মধ্য হইতে একজন তাহাদিগের দিকে আসিতে লাগিল। দেখিয়া অনেকে বৈতরিণীর জলে গিয়া ঝাঁপিয়া পড়িল।

যে আসিতেছিল সে নিকটে আসিয়া বলিল,—ভয় নাই, আমায় চিনিতে পারিতেছ না?

নগরবাসীরা চিনিল। চিনিল যে ইনি সদাশিব। তখন সকলে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল সেনাপতি! সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কালাপাহাড় আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আর কিছুই বলিতে পারিলনা, কেবল কাঁদিতে লাগিল।

সদাশিব বলিলেন,—আর ভয় নাই। রাজা মানসিংহ আসিয়াছেন এ সৈন্যশ্রেণী সমস্ত তাঁহারই। আমরা কালাপাহাড়কে দূর করিয়া দিব।

নগরবাসীরা আশ্বস্ত হইল। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিল,—তবে এইবেলা। আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, সপ্তমাতৃকা বিধ্বস্ত হইয়াছে, বোধহয় এখনও পৌঁছিতে পারে নাই, যদি পারেন তবে এইবেলা মায়ের উদ্ধার করুন।

সদাশিব ইঙ্গিত করিলেন। সেই অপরিমিত সৈন্যশ্রেণী বিরজার মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইল।

সদাশিব অগ্রে অগ্রে, রাজা মানসিংহ পশ্চাতে। আকবরসেনা দেবতারক্ষায় প্রাণপাত করিতে দৌড়িতে লাগিল।

"ক্রম্ ক্রম্ ক্রম্" কালাপাহাড় স্তম্ভিত হইয়া পড়িল।

বিরজামন্দিরের দ্বারে আসিয়াছে, সবেমাত্র সিংহদ্বার চূর্ণ করিয়াছে, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে এ কি !!! কালাপাহাড় চমকিত হইল। মন্দিরের গায়ে গায়ে ক্ষোদিত ঐ দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিতে সমুদ্যত হস্ত স্তম্ভিত হইল। কালাপাহাড় শিহরিয়া উঠিল।

"ক্রম্ ক্রম্ ক্রম্" গর্জ্জনের উপর গর্জ্জন করিতে করিতে কামানের গোলা আসিয়া তাহাদিগের উপর পড়িতে লাগিল।

আর মন্দির ভাঙ্গা হইল না, দেবমূর্ত্তির মুখে আর পদাঘাত করা হইল না, কালাপাহাড় ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল,—অগণিত সেনা তাহাদের উপর ঝাঁপিয়া পড়িতে আসিতেছে। কালাপাহাড় ভাবিল, ইহারা কে ? মুকুন্দদেব কি সুলেমানকে পরাজয় করিয়াছে ? আমাদের সে নীতিবলে কি মুকুন্দদেব পরাজিত হয় নাই ? কালাপাহাড় বড় গোলে পড়িল। মুহূর্ত্তমাত্র বিচলিত হইয়া কালাপাহাড় স্থির হইল। শত্রুগণকে আক্রমণ করিতে সৈন্যদিগকে ইঙ্গিত করিল। কালাপাহাড়ের দল ফিরিয়া দাঁড়াইল। প্রবলবেগে যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

কিন্তু হইলে কি হয় ? কালাপাহাড়ের সৈন্য সব তখন বিশৃঙ্খল, লুটেডাব মত বিছিন্ন হইয়া তাহারা ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিল, কালাপাহাড় হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া এত অল্প সময়েব মধ্যে তাহার শৃঙ্খলা করিয়া উঠিতে পারিল না। মানসিংহেব শৃঙ্খলাবদ্ধ মোগলরাজপুতসেনার কামানের মুখে কালাপাহাড়েব সৈন্য সব তুলারাশির মত ভস্মীভূত হইয়া যাইতে লাগিল। নিমেষের পর নিমেষ যাইতে লাগিল কালাপাহাড়ের সৈন্য ধরাশায়ী হইতে লাগিল।

তখন "জয় বিবজা মাইকী জয়" জয় আকবরবাদ্সা কি জয়" বলিতে বলিতে মোগলবাজসেনা পাঠানবাহিনীর সম্মুখীন হইতে লাগিল।

কালাপাহাড আপন সৈন্যদিগকে বলিলেন। সাবধান, বিপক্ষকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কবিও না। বলিয়াই সেই বিপক্ষসৈন্যের উপর লাফাইযা পড়িল।

সদাশিব আসিয়া তাহার গতিবোধ কবিযা বলিল,—হিন্দুকুলাঙ্গাব। এইবার আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর।

কালাপাহাড় গর্জ্জিযা উঠিল। ভীমবেগে সদাশিবকে আক্রমণ করিল। সদাশিব কালাপাহাড়েব রণকৌশলে বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,—হিন্দুর অভাগ্য, নইলে তুমি হিন্দুদ্বেষী হইবে কেন?

"দুম্" করিয়া একটী গুলি আসিয়া কালাপাহাড়েব বক্ষে লাগিল। কালাপাহাড অশ্ব হইতে ভূতলে পড়িয়া গেল।

সদাশিব ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন শিবরাম। বলিলেন,—ভাল করিলে না।

শিবরাম যোডহাত করিয়া বলিল,—তা জানি, কিন্তু ওদিকে আবার বিশাল্য হইতে সুলেমান নাকি নগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে, আমাদিগকে এখনি সেইদিকে যাইতে হইবে। সুতরাং এখানে

আর বিলম্ব করিলে চলিবেনা। শক্র সব বিনষ্ট হইয়াছে। এখন মানসিংহের হুকুমে এই অবশিষ্টকে মারিয়া ফেলিতে হইল।

সদাশিব দেখিলেন তাই বটে, শক্র আর একটীও নাই, কেবল শবের উপব শব!!! সদাশিব অশ্ব ফিরাইলেন।

তখন সেই বিপুল বাহিণী আবাব উর্দ্ধশ্বাসে নূতন শক্রর সম্মুখীন হইতে চলিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সব চুকিয়া গিয়াছে। অস্ত্রের ঝনঝনা আর শুনা যাইতেছেনা, কামান বন্দুকের সেই তীব্র নিনাদে দিঙ্মুখের গ্রন্থি আর শিথিল হইয়া পড়িতেছে না, সব থামিয়া গিয়াছে। পাঠান পরাজিত হইয়াছে। সুলেমান পলায়ন করিয়াছে। খানজামান তাহার অনুসরণ করিয়াছে। বড় ঝড়ের পর প্রাতঃসূর্য্যোদয়ে সংসারের যেরূপ ভাব হয়, রাজপুরনগরী এখন সেইরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। সাহস করিয়া চক্ষু মেলিয়াছে, কিন্তু চারিদিক্ ফাঁকা দেখিয়া—চারিদিকে কত কি ছিল সে সব নাই দেখিয়া—আকুলপ্রাণে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছে। আহা। কাহার কত কি ছিল, এই অল্পক্ষণের মধ্যে তাহারা সব কোথায় গেল?

সদাশিব দুর্গমধ্যে বসিয়া আছেন। ভাবিতেছেন,—সবই হইল। কিন্তু ইহাতে সুখ কি? মহারাজ নাই, যুবরাজ নাই, আর কাহাকে লইয়া রাজ্য। বুঝি বিরজাও নাই। শিবরামকে পাঠাইয়াছি, শিবরাম আসিয়া বুঝি বলিবে মাতৃমন্দির শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। তবে এতগুলি প্রাণিহত্যা করিয়া হইল কি? হইল কি আমাদের, মানসিংহের নহে। তাঁহার সবই হইল। পাঠান পরাজিত হইল।

বাঙ্গালার সিংহাসন আকবরের হইল। উড়িষ্যাও উপকৃত হইল। মানসিংহের যশের সীমা রহিল না। কিন্তু আমাদের কি হইল? মুকুন্দদেব মরিলেন, বিশালার রণক্ষেত্রে পাঠানের চক্রান্তে পড়িয়া তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। গোবিন্দদেব নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। তবে এখন এ রাজ্য শাসন করিবে কে? সদাশিব আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—আমার মূর্খতা, আমি সেই ঝড় বৃষ্টি মাথায় করিয়া যখন রায়পুরের জঙ্গলে যাইয়া শিবরামকে দেখিতে পাইলাম, তখনই কেন সেই বিচ্ছিন্নাবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নগরে ফিরিয়া আসিলাম না? তা যাক্, তাহার পর যখন ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল, ক্রমে ক্রমে যখন প্রায় সকল সৈন্যই রায়পুরে আসিয়া জমা হইল, তখন কেন আর শত্রুর অপেক্ষায় বৃথা সেখানে কালক্ষেপ করিলাম? তাহার পর রাজা মানসিংহ আসিলেন, তাঁহার সহিত মিলিত হইলাম, তাহারপর নগরে আসিলাম, কেন কিছু আগে আসিলেইত' হইত? ছি। কেন আমি মানসিংহের কথা শুনিলাম? তাঁহার পথপ্রদর্শনের জন্য কাহাকেও না কাহাকেও রাখিয়া আসিলেইত' পারিতাম? আমার দোষেই রাজ্য নষ্ট, রাজা মৃত, রাজপুত্র নিরুদ্দিষ্ট।

সদাশিব কাঁদিতে লাগিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আর শিববাম। সদাশিবের হুকুম পাইয়াই শিবরাম বিরজার মন্দির পানে ছুটিলেন। কিন্তু যাইবেন কেমন করিয়া? পথ রক্তে পিচ্ছিল, শবদেহে বন্ধুর। সেই স্তূপীকৃত শবদেহ লঙ্ঘন করিতে শিবরামের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সময়ে সব করা যায়, সময়ে সব সহা যায়, কিন্তু এখন এই মুমূর্ষুর কাতর ধ্বনিতে শিবরামের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। শিবরাম ভুলিয়া গেল যে ইহারা শত্রু।

শিববাম সে পথে যাইতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে সে পথ ত্যাগ করিয়া শিবরাম অনেক ঘুরিয়া বিরজার মন্দিরে যাইল। দেখিল মন্দিরের সিংহদ্বার ভগ্ন। শিবরাম কাঁপিতে কাঁপিতে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল। ভয়, পাছে মায়ের ভগ্ন মূর্ত্তি দেখিতে পায়।

প্রবেশত' করিল, প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল তাহাতে শিবরামের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। শিবরাম বসিয়া পড়িল। দেখিল,—মায়ের সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে।

তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া খানিক পরে শিবরাম কাঁদিয়া ফেলিল। তখন খুব খানিক কাঁদিল। তাহার পর কিছু শক্তি হইল।

উঠিয়া একবার সিংহাসনের নিকটে যাইল। কিছুই দেখিতে পাইল না। শিবরাম বিস্মিত হইল, ভাবিল,—শত্রু যদি ইহা ধ্বংস করিয়া থাকে তবেত' তাহার কিছু না কিছু চিহ্ন থাকিবে? শিবরাম বেশ করিয়া চারিদিক্ অনুসন্ধান করিল, কিছুই দেখিতে পাইল না! শিবরামের বিস্ময় আরও বর্দ্ধিত হইল। তাহার পর ভাবিল,—তবে হয়ত' কালাপাহাড ইহাকে বাহিরে লইয়া গিয়া কোথাও চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। শিবরাম বাহিরে আসিল, মন্দিরের চারিপার্শ্ব তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাইল না। তখন ভাবিল হয়ত' ইহারা আরও বাহিরে লইয়া গিয়া চূর্ণ করিয়াছে।

সদাশিব মন্দিরের অনেক বাহিরে গেল। এদিক্ ওদিক্ সন্ধান করিতে লাগিল, কোথাও পাইল না। নিকটে কেহ নাই যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে। সদাশিব খুঁজিতে খুঁজিতে কিছু দূরে গিয়া পড়িল। খানিক দূর গিয়া দেখিল কে একজন সন্ন্যাসী ঐ গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সদাশিবের সন্দেহ হইল, ছুটিয়া তাহার নিকটে যাইলে সেও একটু সরিয়া গেল।

সদাশিব জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি কে? সে বলিল,—আমি পথিক, সন্ন্যাসী।

সদা। পথিক, তা দাঁড়ায়ে কেন? পথ দিয়া চলিয়া যাও?

পথিক বলিল,—যাইতে পারিতেছি না। কাল হইতে এই গাছ তলায় আশ্রয় লইয়াছি। আপনি বলিতে পারেন নগরের হাঙ্গামা মিটিয়াছে কি?

সদাশিব বলিল,—মিটিয়াছে, কিন্তু এ পথেত' যাইতে পারিবে না, শবদেহে পথ একেবারে সমাচ্ছন্ন। আর একদিন এইখানেই অপেক্ষা কর, পথ পরিষ্কার হইলে যাইবে।

"তাহাই করিব" বলিয়া লোকটা বসিয়া পড়িল।

সদাশিব এদিক্ ওদিক্ দেখিতে লাগিল।

পথিক বসিয়া বসিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলিতে পারেন জয় কাহার হইল?

সদাশিব বলিল,—তাহাও কি আর বলিয়া দিতে হয়? পাঠানের জয় হইলে কি আর এমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিতাম?

পথিক বলিল,—তা বটে।

সদাশিব ভাবিল,—মন্দ নয়, এ লোকটা কে? কাল হইতে এখানে বসিয়া আছে বলিতেছে, কাল এই এত যুদ্ধ হইয়া গেল এখন জিজ্ঞাসা করিতেছে "কাহার জয় হইল?" লোকটা পাগল নাকি?

আবার ভাবিল,—যেই হউক্ কাল অবধি যখন এখানে বসিয়া আছে বলিতেছে তখন ইহাকেই একবার জিজ্ঞাসা করা যাক্ না?

তখন সদাশিব তাহার দিকে মুখ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ওহে ভাল কথা, একটা খবর দিতে পার? তুমি ত' কাল অবধি এখানে আছ, বলিতে পার কালাপাহাড়ের দলেরা বিরজার মন্দিরে আসিয়া মায়ের মূর্ত্তি কোথায় ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে?

পথিক বলিল,—মায়ের মূর্ত্তি কি কালাপাহাড় ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে? তবে আর তোমরা লড়াই করিলে কেন? এই বুঝি তোমাদের যুদ্ধজয়। আশ্চর্য্য!

সদাশিব ভাবিল—কথাটা ঠিক্, কিন্তু তা বলিয়া কথায় ইহার কাছে ঠকা হইবে না। বলিল,—তুমি লড়াই'র কি বোঝ' যে তোমায় ইহার উত্তর দিব। এখন তোমায় যা জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার কোন উত্তর দিতে পার?

পথিক বলিল,—পারি।

সদাশিব ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তবে বল?

পথিক বলিল,—আমার সঙ্গে আইস। সদাশিব তাহার সঙ্গে চলিলেন।

ববাবব দুই জনে বাস্তা পবিত্যাগ কবিযা বাস্তার পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী বনের ভিতব যাইতে লাগিল।

সদাশিব জিজ্ঞাসা করিল,—এতদূরে কোথায় লইয়া যাইতেছ?

পথিক তখন হাঁসিয়া উঠিল, বলিল,—তবে বীব। এ সাহসটুকুও নাই, এতবড লডাইটা যতে কবিলে?

সদাশিব পথিকেব মুখপানে চাহিয়া বহিল।

পথিক বলিল,—দেখিতেছ কি?

সদাশিব বলিল,—তুমি কে?

পথিক বলিল,—আমি বামকুমাব সিংহ। ছি ভাই। আমায চিনিতে পার নাই?

সদাশিব তখন অপ্রতিভ হইল। বলিল তোমার সন্ন্যাসীব বেশ দেখিযা চিনিতে পারি নাই। তা বামকুমার। ব্যাপাব কি? তুমি এখানে কেন? যুববাজ কোথায়?

তাহাই বলিব বলিয়াই তোমায লইয় আসিয়াছি। তুমি যখন দেবীব মন্দিবে প্রবেশ কর তখনই আমি তোমায় দেখিতে পাইযা ছিলাম। তুমি এদিকে না আসিলেও আমি তোমায এই দিকেই লইযা আসিতাম। তা যাক্, তুমি ভাবিত হইও না। যুবরাজ নির্ব্বিঘ্নে আছেন, বিবজা দেবীর কোন অনিষ্ট হয নাই।

সদাশিব বিস্মিত হইযা জিজ্ঞাসা কবিল,—এ কি রকমে কি হইল?

রামকুমার বলিল,—তুমি সেই সন্ন্যাসীকে জান? যিনি মার মন্দিরে আসিয়া এ যুদ্ধের দিন কতক আগে হইতে সশিষ্যে বাস করিতেছিলেন? তাঁহারই বুদ্ধিবলে আমরা সেই শত্রুর কবল হইতে বিরজাদেবীকে রক্ষা করিতে পারিয়াছি। সে কথা পরে

শুনিও, এখন আমরা এই জঙ্গলের ভিতরেই আছি। যুবরাজ আজ প্রাতঃকালেই আমাকে এই ছদ্মবেশে নগরের অবস্থা দেখিতে পাঠাইয়াছেন আমি তাই এখানে আসিয়াছি। তোমার সহিত দেখা হইল ভালই হইল। চল যুবরাজকে লইয়া নগরে যাই।

শিবরাম মহানন্দে রামকুমারকে আলিঙ্গন করিয়া জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উৎপক্ষ্মণোর্নয়নয়োরুপরুদ্ধবৃত্তিং বাষ্পং কুরু স্থিরতয়া শিথিলানুবন্ধম্ ।
অস্মিন্নলক্ষিতনতোন্নতভূমিভাগে মার্গে পদানি খলু তে বিষমীভবন্তি ॥

কে তুমি ? কোথায় যাইতেছ ? দাঁড়াও ? অত দ্রুত কেন ? রাত্রি ঘোরান্ধকারা, পথ অপরিচিত, একাকী যাইতে পরিবে কেন ? দাঁড়াও ? নিশ্বাস ফেল ? চোকের জল মুছ ? পথ দেখিয়া চলিতে থাক ? শুনিলে না ? আবার ছুটিয়া যাইতে লাগিলে ? তা' বটে, শুনিবেনা বটে, দাঁড়াইতে পারিবেনা বটে, তা' তোমার দোষ নাই। সৃষ্টিই তাই। যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনিই জানেন ইহা কেন ? আমরা দেখি, কবি, হই, এই মাত্র। বুঝিব কেমন করিয়া ? বুঝিব কেমন করিয়া? আমি যে মাটি—আমি মাটি হইয়া রহিয়াছি। আমি অচেত—আমি অসাড়—আমি মরিয়া রহিয়াছি। আজ নহে, তোমরা দেখিতেছ আমি মরিয়াই জন্মিয়াছি। আর এই যুগের পর যুগ কাটিয়া যাইতেছে, আমি তেমনই রহিয়াছি—তেমনিই মরিয়া রহিয়াছি---তেমনিই তোমাদের পদতলে পড়িয়া রহিয়াছি। তবে আমার এত পাপ কিসের ? বলিতে পার, যে চিরকাল মৃত তাহার শিরে এ কর্ম্মফলের বোঝা কেন ? সে কর্ম্ম করিল কবে ? তবে আমার বুকে এত ভার কেন ? আমার বুকে হিমাদ্রি কেন ? বিন্ধ্য কেন ?

শুধু কি তাই? শুধুই কি তার বোঝা? তাহা হইলে ত' বাঁচিতাম, তাহা হইলে ত' আজ এ ধরার অন্তরে আনন্দ ধরিত না। কিন্তু তাহা হইল কই? কোথা হইতে আমার বুকের ভিতরে আশ্রয় লইল, আমি বুঝিতে পারিলাম না, আমি মরা, আমি বুঝিব কেমন করিয়া? শেষে তাহারাই আমার সর্ব্বস্ব হইল। আমি যে ধরা সেই ধরাই রহিলাম—তাহারা ধরাধর হইল। মরি! মরি! আর ত' তাহারা আমার ভার নয়, আর ত' তাহারা আমার মিছে বোঝা নয়, এখন যে তাহারা ধরাধর। তাহারা না থাকিলে বুঝি ধরা থাকিতে পায় না—মরা ধরা বুঝি আবার মরিয়া যায়। ঐ হিমাদ্রির পর্ব্বে পর্ব্বে বিভক্ত বন্ধুর শিখরাবলীই যে আজ পৃথিবীর মানদণ্ড। আর ঐ যে উহার নবসূর্য্যালোকপ্রতিভাসিত তুষারধবল শিখরাবলী কাঞ্চননিস্রববিধৌত রজতপিণ্ডের ন্যায় আকাশের গায়ে গায়ে জড়াইয়া রহিয়াছে, উহাই যে পৃথিবীর সারাৎসার - মাথার মণি—হৃদয়ের প্রতিবিম্ব—নয়নের জ্যোতি। নহিলে পৃথিবীর আছে কি? পৃথিবী ছাই। পৃথিবী মাটী। আর হা বিধাতঃ! তাহারই উপর তোমার বজ্রাঘাত। পৃথিবী সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয় না কেন?

কে বলিবে এ আপনার সর্ব্বস্ব পরকে দিয়া এ সুখদুঃখের সৃষ্টি কেন? পৃথিবী তা বলিবে কেমন করিয়া কেন এমন হয়? তা চামেলী বলিবে কেমন করিয়া সে আজ কেন এমন? সে বলিবে কেমন করিয়া সে কেন আজ এমন করিয়া ঐ শররাশির দিকে ঐ তাহার কোথাকার কে কাহার জন্য দৌড়িয়া যাইতেছে? সে কেমন করিয়া বলিবে আজ তাহার কি হইয়াছে? সে কেমন করিয়া জানিবে এই কল্লোলিনী, ঐ নীরব নির্জন গিরিগহ্বরে জন্মগ্রহণ করিয়া শীতলপ্রাণা সলিলময়ী মেঘমালার সহিত ক্রীড়া করিয়া, কখন কি পাপ করিয়া ফেলিল, যে তাহার ফলে আজ তাহাকে কোথা হইতে কোথায় পড়িতে হইতেছে?

কোথা হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে কোথায় ছুটিয়া যাইতে হইতেছে? উপলের পর উপল, কঠোর, বন্ধুর, নদীর তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই, শরীর বিদীর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ আলুলায়িত, ঐ দেখ, কোথাকার নদী কোথায় ছুটিতেছে। কেহ কি উহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে. না ওই কাহার ও কথায় কর্ণপাত করে? তা চামেলী শুনিবে কেন? চামেলী দাঁড়াইবে কেন? চামেলী ছুটিতেছে। চক্ষে দরদরিত ধারা, নতোন্নত ভূমি ভাগে পদদ্বয় ছিন্ন ভিন্ন, চামেলীর ভ্রুক্ষেপ নাই, চামেলী উর্দ্ধশ্বাসে, চামেলী প্রাণপাত করিয়া ঐ শবরাশির দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। চামেলী ভাবিতে পারে না ঐ শবরাশির ভিতরে তাহার কি আছে। হুঙ্কারের পর হুঙ্কার করিয়া অশনি গর্জ্জন করিতেছে, ঐ পড়ে, ঐ বুঝি আমার সর্ব্বস্বের শিরে বজ্রাঘাত হয়, পৃথিবী কম্পিত, পৃথিবী আকুল, পৃথিবী দিশাহারা, তাহার পর পৃথিবী স্তম্ভিত। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, পৃথিবী তখন সর্ব্বংসহা। চামেলী শিহরিয়া উঠিল। এই শবরাশির ভিতর কি যেন কি পাছে দেখিতে পায় ভাবিয়া চামেলী কাঁপিয়া উঠিল। ছুট্, ছুট্, ছুট্, চামেলী এক মৃত-দেহস্পর্শে থমকিয় দাঁড়াইল।

এই কি রণক্ষেত্র। এই খানেই কি আমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত। চামেলী দাঁড়াইয়া ছিল বসিয়া পড়িল। নিকটের শৃগালগুলা একটু সরিয়া গেল। চামেলী চমকিত হইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল বড় অন্ধকার। চামেলীর ভিতরে বাহিরে আজ বড় অন্ধকার। বড় কিছু দেখিতে পাইল না। শুনিল কেবল শৃগাল কুক্কুরের কোলাহল। ভীমা নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ক্ষণেকের জন্য মধ্যে মধ্যে তাহারা ডাকিয়া উঠিতেছে। আর কচিৎ কোথায় ঐ মুমূর্ষুর ক্ষীণ আর্ত্তস্বর।

চামেলী আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। ঐ বুঝি রাজুর কণ্ঠস্বর।

চামেলীর চক্ষু বিস্ফারিত হইল! পাগলিনীর ন্যায় চামেলী সেই শবক্ষেত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, শৃগাল কুক্কুরেরা সব সরিয়া যাইতে লাগিল, আবার কখন বা তাহাকে কামড়াইতে আসিল। চামেলীর সংজ্ঞা নাই, শবদেহের পর শবদেহ, চামেলী পড়িতেছে আর উঠিতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে চামেলী একটা মৃত ঘোড়ার গায়ে ঠেকিয়া পড়িয়া গেল। উঠিতে যাইবে এমন সময়ে "উঃ। চামেলী!" চামেলী শুনিল চামেলীর নাম। চামেলী উঠিয়া বসিল, ভাবিল, একি। আমি কোথায়? এতক্ষণ আশা ছিল, মনেরও গতি ছিল, চামেলীর বল ছিল, চামেলী বাঁচিয়া ছিল, চামেলী ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিতেছিল; এইবার চামেলীর সব ফুরাইল! বজ্রধ্বনি প্রশমিত হইল, বজ্র পতিত হইল, চামেলী মরিয়া গেল!!! চামেলী তখন সেই অঙ্কসংলগ্ন মৃতদেহের মুখের কাছে মুখ লইয়া নির্নিমেষে দেখিতে লাগিল। দেখিল,—রাজু!!! চক্ষু মুদ্রিত, মুখ অবিকৃত, দেহ নিস্পন্দ। চামেলীর চক্ষু তাহাতে গাঁথিয়া রহিল।

ও কি। আবার "উঃ" বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, চামেলী ধৈর্য্য হারাইল, চামেলী রাজুর বুকের উপর ঢলিয়া পড়িল।

"তুমি কে?" রাজুর ক্ষীণ কণ্ঠ দিয়া শুষ্ক অধর বহিয়া শব্দ হইল,— তুমি কে? ভিখারিণি। আমার অপরাধ লইও না। আমি তখন চিনিতে পারি নাই, চিনিতে পারি নাই যে তুমিই চামেলী। রাজু চক্ষু চাহিল, দেখিল,—এ কি!!! রাজুর সে অসাড় দেহ একবার সজোরে নড়িয়া উঠিল। বলিল,—এ কি!!! তুমি? তুমি আসিয়াছ, না শুধু আমার চিন্তা? রাজুর শিথিল হস্তদ্বয় আসিয়া চামেলীর স্কন্ধ জড়াইয়া ধরিল।

চামেলী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজুর গলা জড়াইয়া মুখের

উপর মুখ দিয়া চামেলী বলিয়া উঠিল,—কেন তুমি আবার কথা কহিলে? আমি যে বেশ ছিলাম।

ওগো! তাই বটে। তাই বটে গো। তাই বটে। চামেলী! তুমি মরিয়া গিয়াছিলে, তোমার সকল জ্বালা ঘুচিয়া গিয়াছিল, তুমি বেশ ছিলে। তোমার কিছুই ছিল না, তুমি কিছুই ছিলে না, বেশ ছিলে বই কি? তা হইবে কেন? সংসার তাহা সহ্য করিবে কেন? সে তোমায় অমন করিয়া মরিতে দিবে কেন? জল, পোড়, কাদ, আকাশ ফাটাইয়া দেও, তবে না সংসার তোমায় ছাড়িয়া দিবে? তুমি যে সংসারের দাস। তুমি মরিয়া গিয়াছিলে, সংসার আসিয়া তোমায় পদাঘাত করিল, তোমার চৈতন্য হইল, তুমি রাজুর কথা শুনিলে, আশা আসিয়া নৈরাশ্যের বিকট মূর্ত্তি তোমার নয়নের সম্মুখে ধরিয়া রাখিল, তোমার কত কি—অতীতের সেই সুধালিপ্ত মুহূর্ত্ত হইতে তোমার প্রাণের সেই কত কি—যাহা তোমার প্রাণে গাঁথা—ও যে আসিয়া তাহাই ছিঁড়িয়া লইতে লাগিল। আর ভবিষ্যৎ—তোমার কল্পিত সুখপুঞ্জ—এই করিব—এমনি করিয়া দেখিব—এমনি করিয়া কথা কহিব—ওগো। ইহার যে ভাষা নাই, শব্দ নাই তাহাও যে কত কি—তোমার সঙ্গেসঙ্গে ঘুরিতেছিল,তোমার শিরায় শিরায় ছুটিতে ছিল, ঐ দেখ, তোমায় দেখাইয়া দেখাইয়া ঐ রাক্ষস তাহা ছিনিয়া লইতেছে, তুমি আর বেশ থাকিবে কেন?

চামেলী ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। তখন আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া চামেলী সেই অনেক দিনের গৃহীত বিষের বড়িটী খাইয়া ফেলিল।

এইবার জ্বালা জুড়াইল। চামেলীর অন্ধকার ঘুচিল। চামেলী স্থির হইল। আর ভয় কি? সংসারের মুখে একবার পদাঘাত করিতে পারিলে আর ভয় কিসের? চামেলী মাথা তুলিল, রাজুর

চক্ষের জল মুছাইয়া দিল, রাজুর বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

রাজু বলিল। ক্ষীণ অতি ক্ষীণকণ্ঠে রাজু বলিল,—চামেলী।

চামেলী বলিল,—প্রাণেশ।

রাজু। আমিত' চলিলাম।

চামে। চল যাই।

রাজু বিস্মিত হইল। বলিল,—সে কি?

চামেলী রাজুর গলা জড়াইয়া বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল। বলিল,—তোমায় ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছি। আমার কি ধর্ম্ম নাই?

রাজু নির্ব্বাক্। কেহ দেখিতে পাইল না রাজুর চোখের কোণে এখন কত জল আর সে জলের অর্থই বা কত?

একটু শান্ত হইয়া রাজু বলিল—চামেলি। তুমি আমায় ধর্ম্মচ্যুত কর নাই। আমার ধর্ম্ম ছিল না। এতদিন তাহা বুঝিতে পারি নাই। কেবল ভাবিতাম, যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতাম, তোমায় চিনিতাম না, তাই চিনি নাই। আজ চিনিলাম। আইস আমার ধর্ম্মশিক্ষয়িত্রি। আজিকার এই আলোকে আলোকেই তোমায় দেখি। এ দেখায় আর আবরণ হইবে না, আজিকার দিনের দেখাই দেখা, হিন্দু এই দেখাই চায়। মূর্খে তাহা বুঝে না, চামেলি! তাই এতদিন বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিয়াছি চামেলি! এস, আমায় ধর, আমায় উদ্ধার কর। বড় অন্ধকার প্রভো! আমায় রক্ষা করিও।

রাজু চামেলীর গলা জড়াইয়া ধরিল। চামেলীও রাজুকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল। তাহার পর আর বড় বেশী বিলম্ব হইলনা, সব ফুরাইয়া গেল।

ফুলমানী পিপাসার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিল। সহমরণের ন্যায় ইহাও অধীরতা ও অপর্য্যবসিত প্রেমের

পরিণাম বটে, কিন্তু ইহাতেও মোহিত হইতে হয়। ইহারাই পারে—চেষ্টা করিলে ইহারাই বুঝি প্রেমপ্রাসাদের ছাদে উঠিতে পারে। ইহারাই আমাদের শিক্ষাস্থল।

চামেলী মরিয়া যেন ইহা শিখে আর সুখিনী হয়। বাঁচিয়া অভাগিনী একদিনের জন্যও সুখিনী হইতে পারে নাই।

জগদীশ্বর! চামেলীর মঙ্গল করিও।
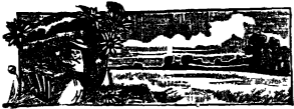
সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দদেব আবার নগরে আসিয়াছেন। পিতৃশোকবিহ্বল রাজপুত্রকে রাজা মানসিংহ অনেক বুঝাইয়া রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছেন। গোবিন্দদেব রাজা হইয়াছেন। সদাশিবের শোকের অনেক লাঘব হইয়াছে। নগরবাসীরাও যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা ভুলিয়া যাইতে হইবে বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। নগরে আবার ধীরে ধীরে আনন্দের মূর্ত্তি আসিয়া দেখা দিতেছে, নগরবাসীরা শান্ত হইতেছে। বিরজাদেবী আবার আসিয়া মন্দির অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

গোবিন্দদেব পরম উপকারী অতিথি মহারাজ মানসিংহকে পরম সমাদরে রাখিয়াছেন। আর অতিথির অতিথি জগৎ, জগদীশ্বর, হৃষীকেশ, গোবিন্দদেবের সততায় মোহিত হইয়াছেন।

মানসিংহ রাজপুরেই রহিলেন, আগ্রায় আকবরের নিকট এ পাঠানপরাজয়ের কথা বলিয়া পাঠাইলেন বাঙ্গালা এখন তাঁহার, বাঙ্গালায় এখন কাহাকে রাজা করা যাইবে মানসিংহ আকবরের নিকট তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। তাহার সংবাদ না আসা পর্য্যন্ত মানসিংহকে এই প্রদেশেই থাকিতে হইবে। তা বলিয়াও বটে,

আর গোবিন্দদেবও তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন না কিছুদিন তাঁহাকে পরিচর্য্যা করিবেন গোবিন্দদেবের তাহা একান্ত ইচ্ছা, সুতরাং মানসিংহ গোবিন্দদেবের অতিথি হইয়া রাজপুরেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। গোবিন্দদেব পরম প্রীত হইলেন।

জগৎরায়ের সকল আপদ চুকিয়া গিয়াছে, তাঁহারা এখন নির্ব্বিঘ্নে যাইয়া বাঙ্গালায় বাস করিতে পারেন, কিন্তু তাহাতেও গোবিন্দদেবের আপত্তি। তাঁহার ইচ্ছা মানসিংহ যতদিন আছেন, তাঁহারাও ততদিন থাকুন। অগত্যা তাঁহাদের তাহাই করিতে হইতেছে।

কিন্তু এমন করিয়া এক জায়গায় বসিয়া থাকিলে কি হইবে? জগৎরায় গোবিন্দদেবের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন আমরা শ্রীপুরুষোত্তম দর্শনে যাইতে চাহি।

গোবিন্দদেব আপত্তি করিলেন না। তাঁহাদের পুরুষোত্তম যাইবার বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। ঊষা সন্ধ্যার পরামর্শ এইবার সফল হইল।

মানসিংহও ক্রমে এ সংবাদ পাইলেন, তিনিও পুরুষোত্তম যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

গোবিন্দদেব পরম সমারোহে তাহার উদ্যোগ করিয়া দিলেন। সকলে পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥

গোবিন্দদেব অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী আর ফিরিলেন না, তিনি পুরষোত্তমেই চলিলেন। সঙ্গে সুধীর। সন্ন্যাসীর সঙ্গে সুধীর—যেন সমুদ্রের সঙ্গে তরঙ্গ, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি, প্রেমের সঙ্গে পিপাসা। বড় সুন্দর। দেখিতে নহে, বুঝিতে। সন্ন্যাসী অগ্রে অগ্রে, সুধীর পশ্চাতে, :কিন্তু বেশ কাছে কাছে। তাত' বটেই, সমুদ্র অগ্রে অগ্রে, তরঙ্গ পশ্চাতে কিন্তু কত কাছে। সমুদ্রের ছোটা হইয়া গিয়াছে, যতদূর আগিয়ে যাইবার যাওয়া হইয়া গিয়াছে, তাহার ক্রিয়া অতীত।০ তরঙ্গ যাইতেছে, তাহার ক্রিয়া এখনও বর্ত্তমান। তফাৎ কেবল কালের, নহিলে ক্রিয়া সেই এক। তাই তরঙ্গে সমুদ্রে বেশ মিল হইয়াছে।

"সুধীর আজ বড় আনন্দময়। তাহার সম্মুখে সন্ন্যাসী, যেন সম্মুখে সমুদ্র, সম্মুখে জ্ঞান, সম্মুখে প্রেম। সুধীর ভাবিতেছে,—আমি জ্ঞান চাহিনা ভক্তি চাহি, সমুদ্র চাহিনা তরঙ্গ চাহি, প্রেম চাহিনা পিপাসা চাহি, এমনি করিয়া ইহাদের কাছে কাছে থাকিতে চাহি, হইয়া কি হইবে? দেখিয়া বড় সুখ।

চলিতে চলিতে সুধীরের মনে হইল সেই গঙ্গাসাগরের দৃশ্য। মনে হইল সেই অনেক দূর হইতে হেলিতে দুলিতে আনন্দভরা সেই একটী তরঙ্গের তীরে আসিয়া নৃত্য করিবার কথা, আর মনে হইল তাহার সেই তীরের সহিত গলাগলি করিতে করিতে সমুদ্রে গিয়া ঢলিয়া পড়ার কথা। আ মরি। সুধীর ভাবিল,—আমিও তীরে যাই।

সুধীর চলিতেছে, আর তাহার প্রাণ আসিয়া উষার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে। সুধীরের প্রাণের সমুখে এখন বিশাল প্রেম, সে উষার সহিত গলাগলি করিতে করিতে তাহার দিকে ঢলিয়া পড়িতেছে।

সুধীরের প্রাণ এখন আনন্দময়, সে এখন নিরুদ্বেগে উষার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ভাবিতেছে,—উষা। তুমি এখন আমার তরঙ্গের সমুদ্রতীর, আমি তোমার বুকের উপর গড়াইয়া পড়িয়া ঐ অপার অপরিমেয় প্রেমে মিলাইতে থাকিব। আমার আর কিছুই আশা নাই, আমার আর কোন মোহ নাই। সন্ন্যাসীর সঙ্গে থাকিয়া আমার সকল মোহ কাটিয়া গিয়াছে। আমার জন্ম আর আমার ভাবনা নাই। তোমার দেখিতে পাইতেছি না বলিয়া আর আমার দুঃখ নাই। তুমি আমার অন্তরে আসিয়াছ, ইহ জীবনে আর তোমার বিরহ নাই। সে ভ্রম আমার ঘুচিয়া গিয়াছে। যাহার ভয়ে তোমায় ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম সে ভয় আমার আর নাই।

সুধীর যাইতেছে, সুধীরের শরীর কেবল অগ্রসর হইতেছে। মন অসংস্থিত, গমনের দিকে তাহার মন নাই। সে উষার পানে ফিরিয়া আসিতেছে। উষারূপে সে প্রেমের বিশাল মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছে।

ক্রোশের পর ক্রোশ কাটিয়া গেল তাহার দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। মহানন্দে দুজনে পথ হাঁটিতেছেন।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুধীর! আজ অনেক অবকাশ। কথাটা অনেক দিনের হইলেও আজ জিজ্ঞাসা করি। বুঝিয়াছ কি আকাশে নক্ষত্রমালা কেন?

সুধীর চমকিত হইল, কিছু সঙ্কুচিত হইল, ভাবিল,—সন্ন্যাসী কি অন্তর্যামী! বলিল,—বুঝিয়াছি প্রভু। বুঝিয়াছি। বুঝিয়াছি আকাশ, আকাশ। নক্ষত্রমালা, নক্ষত্রমালা।

সন্ন্যাসী একটু হাঁসিলেন। বলিলেন,—ইহার অর্থ কি?

সুধীর বিস্মিত হইল। বলিল,—সে কি?

সন্ন্যাসী বলিলেন,—দোষ কি?

সুধীর বুঝিল। বলিল,—অর্থ? ইহার অর্থ নাই। যাহা জটিল তাহাতেই অর্থ থাকে, ইহাতে জটিলতা নাই। ইহা বড় পরিষ্কার। এই হিসাবে পরিষ্কার যে যেমন এক সূত্রে গ্রথিত কোন ফুলের মালার প্রত্যেক ফুল আপনা আপনি স্বতন্ত্র, এ উহার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া যে এ উহারই হইয়া গিয়াছে তাহা নহে, তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ডসূত্রে গ্রথিত নানা বস্তুর মধ্যে আকাশ স্বতন্ত্র, নক্ষত্রমালাও স্বতন্ত্র, সুতরাং এ উহাতে কেন? এ প্রশ্নই অসম্ভব, তবে আর তাহার উত্তর কি? আমরা শুধু সেই মূল সূত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্থূলতঃ দেখিব আহা বেশ, ঐ মালা ছড়াটি বেশ সুন্দর। ঐ আকাশে নক্ষত্র মালা দেখিয়া মোহিত হইব, দুটীতে বেশ মিলিয়া মিশিয়া সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইব, এই মাত্র। কেন? কি অর্থ? এসব খুঁজিয়া আকুল হইব না। নিরাকুলতাই শান্তি, আর আমার বুদ্ধিতে তাহাই মুক্তি।

তা বটে। সন্ন্যাসী বলিলেন,—তা বটে, কিন্তু সংসার তোমারও নহে আমারও নহে, যে কেবল মিলিয়া মিশিয়াই সুন্দর মূর্ত্তিতে সুখী

করিবে। অমিলও আছে, পরিবর্ত্তনই যে সংসারের ধর্ম্ম। তখন কি করিব? সুখ কোথায় পাইব?

সুধীর বলিল,—সংসারে বস্তু অনন্ত, সুতরাং তাহার জ্ঞানও অসীম। একটী বস্তুর জ্ঞানের নামই তত্ত্বজ্ঞান নহে।

সন্ন্যাসী প্রীত হইলেন। বলিলেন,—ঠিক্ বলিয়াছ। কিন্তু একটা কথা বাকি আছে। তাহা হইলে মনের উপায় কি? তাহাকে কি শূন্যময় হইতে হইবে? সবই ছাড়িতে হইলে তাহার আর উপায় কি? কিন্তু তাহাতে কি কিছু সুখ আছে?

"না"। সুধীর বলিল,—না, উহাত' মনের মৃত্যু। মরিয়া কি সুখ? উহাতে সুখ নাই বলিয়াই মনকে জ্ঞানময় করিতে হয়, তখন মন থাকেনা, জ্ঞান হয়। জ্ঞান সজীব, জীবেরই সুখের অনুভব হয়। কিন্তু প্রভো! আমি তাহা চাহিনা, আমি এই বিপুল সংসারের কিছু না কিছুকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানকে দেখিতে চাই। জ্ঞান হইতে আমার সাধ নাই, জ্ঞানের পার্শ্বে দাঁড়াইব তাহাকে দেখিব আমার শুধু ইহাই সাধ। জানিনা ইহা আমার পড়িবার পদস্খলন কি না?

সন্ন্যাসী সুধীরের হৃদয় দেখিয়া মোহিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন,—সাধু বৎস! সাধু তুমি ভক্তির মর্ম্ম বুঝিয়াছ, তুমি জ্ঞান চাহিবে কেন? আমরা অবোধ, মনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারি নাই, তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হইয়াছে। জ্ঞান কোথায়? জ্ঞান অসম্ভব, ভক্তিই সার। আজ আমার চক্ষু ফুটিল। প্রকাশ্যে বলিলেন,—বৎস! আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হুউক। ভাষার অন্য শব্দ নাই বলিয়াই উহাকে কামনা বলিতে হইল, নহিলে উহা কামনা নহে।

সুধীর সন্ন্যাসীর পদধূলি লইল। গদ্গদচিত্তে সন্ন্যাসী সুধীরকে আলিঙ্গন করিলেন। সুধীর সর্ব্বান্তঃকরণে মজিয়া গেল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আর ঊষা। জগন্নাথের পথে শকটারোহণে ঊষা যাইতেছে। সঙ্গে সন্ধ্যা। সন্ধ্যা গাড়ীর একপাশে পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছে। গ্রীষ্মকাল, মধ্যাহ্নের বিশ্রামের পর গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গাড়ীর সম্মুখের জানালা দিয়া ঝুর্ ঝুর্ করিয়া হাওয়া আসিতেছে, আর পার্শ্বের জানালাপথে পথের দুধারী রক্ষাবলীর নবপত্রবিমণ্ডিত বসন্তবাতান্দোলিত, সর্ব্বাঙ্গের মধুর মূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। সন্ধ্যা তাহা দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

আর ঊষা। ঊষার চক্ষে নিদ্রা নাই। অত রৌদ্রে পথে বড় একটা লোক চলে না, গাড়ীও চলে না, তবে তাহা আরোহীর ইচ্ছা। ঊষারা সবায়ে আহারাদি করিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে। মানসিংহ পশ্চাতে আসিতেছেন, ঊষাদের খান কতক গাড়ী কিছু আগিয়ে আগিয়ে চলিতেছে। খুব ধীরে। উড়িয়ারা গাড়ী চালায় ভাল। পথ প্রায় নির্জ্জনপ্রায়। কোন গোলমাল নাই, কেবল সেই গাড়ী কখানির যা গমনশব্দ, তা-তাহাও বেশ মধুর।

ফুর্ ফুর্ করিয়া গাড়ীর ভিতর বাতাস আসিতেছে, সর্সর্ করিয়া পার্শ্বের বৃক্ষরাজির পত্রাবলীর শব্দ হইতেছে, আর কোথাও

কখনও কোন গাছের অভ্যন্তরে—যেখানে অনেক পাতা—খুব ছায়া—বড় শীতল—সেইখানে বসিয়া দুটী একটী কোকিল ফুক্‌রাইতেছে। বড় মধুর! সময়টী বড় মনোহর। বড় শীতল।

এহেন মধুময় সময়ে সন্ধ্যা ঘুমাইবে না ত' কি করিবে? সন্ধ্যা খুব ঘুমাইতেছে।

আর উষা—উষা বাতাসের ঢেউ গুণিতেছে, আর ভাবিতেছে,—আমি কি? নদীবক্ষে বুদ্‌বুদ্‌। কত ক্ষুদ্র, কত ক্ষীণপ্রাণ। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম আমি, আমি নদীর কে? বুদ্‌বুদের নদী, কিন্তু নদীর বুদ্‌বুদ্‌ কে? এই যে বাতাস—হেলিতে হেলিতে—দুলিতে দুলিতে—ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে—কোথা হইতে কোথায় চলিয়া যাইতেছে, আর উহার চরণস্পর্শে এই যে কত লতা, কত গুল্ম, কত বৃক্ষ, পল্লব-করাগ্র আন্দোলিত করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে, উহারা কি বাতাসের কেহ? বুঝি কেহ নহে। উষা দেখিল,—ঐ পাতাগুলি সব নিশ্চল। কে যেন তাহাদের বুকের উপর একবার পা দিয়া আবার কোথায় চলিয়া গেল। এই নব কিন্তু, পাতার শক্তি হইল না সে বৃন্ত হইতে বিচ্যুত হয়। উষা ভাবিল,—নূতনের পোড়া কপাল, আমি কবে পুরাতন হইব—কবে বিশুষ্ক হইব—কবে এ বৃন্তচ্যুত হইয়া বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া যাইব।

উষা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বহিল। কিছুই ভাবিতে পারিল না। তখন বাহিরের দিকে একবার উদাস দৃষ্টিক্ষেপ করিল। দেখিল,—পাতার সৌভাগ্য আসিয়াছে, বাতাস আসিয়া পাতার চিবুক স্পর্শ করিয়াছে, পাতা সাধ্বসে কাঁপিয়া উঠিতেছে। উষা কি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল, আর চাহিতে পারিলনা, দুই হাতে আপনার দুই চক্ষু আবৃত করিল। ভাবিল,—এ কেন? এমন হয় কেন? কি দেখিতে কি দেখি কেন? কি ভাবিতে কি ভাবি কেন? আচ্ছা

আমার এমন হয় কেন ? আমি বসিয়া আছি, শুনিলাম পাখীটি ডাকিল, গাছের ঐ নিবিড় অন্তরালে বসিয়া পাখীটা ডাকিয়া উঠিল। ডাকিল পাখী, আর আমি শুনিলাম যেন কাহার কণ্ঠস্বর। বাতাস বহিল, এদিক্ ওদিক্ পতিত শুষ্কপত্রের মর্ম্মর ধ্বনি হইল, আমি চমকিয়া উঠিলাম, যেন শুনিতে পাইলাম কাহার পদশব্দ। এ কি! দেখিলাম ঐ বাতাস আসিয়া পাতাটাকে ধরিয়া নাড়িয়া দিল, আর আমি ভাবিলাম ঐ কাহার যেন স্পর্শ আসিয়া আমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কি আশা! কি মোহ! কি ধৃষ্টতা! আমি কে? আমি কেন তাঁহাকে পাইবার আশা করি? আমি তাঁহার কে? বিপুল পৃথিবীর কোথাকার ঐ ধূলিকণাটী একবার আকাশে উড়িয়াছিল বলিয়াই কি আকাশ তাহাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া রাখিবে? আর উড়িয়াছিলই বা বলি কেন? উড়িতে যাইতেছিল। আকাশ চাহে নাই, সে আপনা আপনিই ঐ নীলাম্বরের মধুর কোমল উজ্জ্বল স্নিগ্ধ বিশাল কিন্তু লোচনলোভনীয় রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া ভাবিয়াছিল আমি উহার নিকটে যাইব—ঐ শ্যামকলেবরের এক পাশে আশ্রয় লইব। তাহারপর কোথা হইতে ঝড় বহিল, ধূলি পৃথিবী ছাড়িল, আপনাকে আপনি ভুলিয়া গেল, কেবল বায়ুবেগে বুঝি খানিক উঠিয়াছিল। সেত' শুধু বায়ুর বেগ, আর ত' কিছুই নয়? সে কেন তাহাকে পাইবে? সে দেখিল,—সে এই জীবনে যখন বায়ুর তাড়নায় ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, তখন দেখিল—আকাশ কতদূরে তাহার স্পর্শভয়ে আকাশ কতদূরে উঠিয়া গেল। হায় ধূলি! তোমারই বায়ু, আকাশের কি? আকাশ নিথর নিশ্চল, নির্ব্বিকার। তোমার ইচ্ছা হয় তুমি ঐ মাটীতে পড়িয়াই তাহার ঐ দূরস্থিত রূপরাশিকে দেখিতে থাক, পাইবার আশা করিওনা। আর নাই পাইলে? তুমি ক্ষুদ্র, তোমার প্রাণও ক্ষুদ্র, তবে আর আশা বড় কর কেন?

তোমার ও ক্ষুদ্র প্রাণে অত বড় আশা ধরিবে কেন? তুমি অত বড় আশার ভার সহিতে পারিবে কেন?

আশা কমাও উষা ধূলিকণা! তোমার আশা ছোট করিয়া ফেল? যেমন পড়িয়া আছ, তেমনি পড়িয়া থাক? তোমার আকাশ অনেক দূরে। কিন্তু তোমার পরম ভাগ্য যে তোমার সে তোমার সর্ব্বব্যাপী, তুমি চক্ষু বুজিলেও তাহাকে দেখিতে পাও, আর চাহিলে—তা যে দিকেই চাহিবে সেই দিকেই সেই মধুর মূর্ত্তি। তা তুমিত' পরম সুখিনী, তুমি দুঃখ কর কেন? তোমার ঐ যে দুঃখ, তাহার শিরায় শিরায় সুখ তুমি তাহা দেখিতেছ না কেন?

'তাত' বটেই" ভাবিতে ভাবিতে উষা ভাবিল,—তাত' বটেই এই যে সুখীব!!! আমিই যে সুখীব!!! উষা চক্ষু খুলিল। প্রাণের কত বোঝা যেন এক নিশ্বাসে নামাইয়া ফেলিল। মনে মনে বলিল,—আঃ! কিন্তু উষার অজ্ঞাতে কথাটা মনেমনের না হইয়া মুখের হইয়া পড়িল, প্রাণের ভিতর জায়গা হইলনা বলিয়া যেন কথাটা উপচিয়া বাহির হইয়া পড়িল! সেই শব্দে সন্ধ্যার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

সন্ধ্যা আড়ামোড়া খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল,—কিরে উষা।

উষা বলিল,—বেশ বাতাস আসিতেছে।

"সত্যি নাকি" বলিয়া সন্ধ্যা উষার পিটে একটা আধ-ঘুমন্ত চড় মারিল।

উষা বলিল,—দিদি বাতাস আসচে না কি?

স। এলেই ত' বাঁচি,—হাড় জুড়ায়।

উষা। আর যদি না আসে? উষা প্রথম এই এত বড় কথাটা মুখে আনিল।

সন্ধ্যা উঠিয়া বসিল। উষার মুখপানে চাহিয়া বলিল,—উষা কি ভাবছিলি?

উষা বলিল,—কেন ?

তখন রাস্তা ছাড়িয়া গোশকটখানি গড় গড় করিয়া বালিহস্তা নদী পার হইতে একটা ঢালু পথে নামিয়া পড়িল, আর উষা আচম্কা সন্ধ্যার কোলের উপর গড়াইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা উষার মুখে একটী সস্নেহে চুম্বন করিল।

বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল উষা কাঁদিয়া ফেলিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

এই কি শ্রীপুরুষোত্তম। নীলাম্বরবর্ণ জলধিতীরে এই বিশালপ্রাসাদে যিনি অবস্থিত তিনিই কি জগন্নাথ। যিনি জগতের নাথ তাঁহার উপযুক্ত স্থানই বটে। সংসার পারাবার—তাহার তীরে বসিয়া যিনি দারুময় হইয়া থাকিতে পারেন তিনি জগন্নাথই বটেন। জগতের প্রভু হইতে হইলে,—সংসারকে পদানত করিতে হইলে এইরূপই হইতে হয়—দারুময়ই হইতে হয়। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহের মূর্ত্তি আর কেমন করিয়া লোকলোচনের সম্মুখে ধরিতে হয়? জীবন্ত মূর্ত্তি কোথায়? তাই না দারুপ্রস্তরেই সে সাধ মিটাইতে হয়? ভিতরে যদি এ অংশটুকুও না থাকে তবে আর তাঁহাকে মূর্ত্তিত্বে পরিকল্পিত করি কেন? মূর্ত্তিপূজায় যে পাষণ্ড শুধু বাতুলতা মনে করে তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক। কে পারে? এই সংসারসমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার এই উত্তাল তরঙ্গমালার আস্ফালন শুনিয়া, কে স্থির হইয়া দারুমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? কেহ নহে। মনুষ্য সংসারের তীব্র গর্জ্জনে ব্যাকুল হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইল, কত খুঁজিল, আদর্শ নহিলে মনুষ্য শিখিতে পারেনা, কিন্তু ইহার আদর্শ কোথায় পাইবে? পাইল না। মানুষ তাহার প্রতিকৃতি করিল। শুধু নির্ব্বিকারতা—

মানুষ যাহা সার বলিয়া মনে করে—যাহা একমাত্র শান্তি বলিয়া বিবেচনা করে—তাহা দিয়া সেই আদর্শের প্রতিমা করিল। মানুষ গাছ পাথর দিয়া ঈশ্বর বানাইল। নির্ব্বিকারতাই ঐশ্বর্য্য, তাহাই যাঁহার, তিনিই ঈশ্বর। প্রতিমা ঈশ্বর হইল, মানুষের আদর্শ মিলিল! অনেক পাঁজী পুঁথি লিখিয়া সেই আদর্শ ইচ্ছার এই অস্ফুট মধুরালোক যেদিন ব্যাকুলিতের প্রাণ শীতল করিয়াছিল, সেদিন এখন কোথায়? তাহা আর এখন বুঝিনা বলিয়াই না আমরা পৌত্তলিক! অনেকেশ্বরবাদী!

সুধীর সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া সমুদ্রতরঙ্গের উৎক্ষেপাক্ষেপময় ক্রীড়া দেখিতেছে, আর ভাবিতেছে,—সংসার কি বিচিত্র!

সুধীর পুরুষোত্তমে আসিয়াছে। পুরুষোত্তমের দর্শন করিয়া সুধীর কৃতার্থ হইয়াছে। পুরুষোত্তমের বিকারবিহীন মূর্ত্তি দেখিয়া সুধীর সংসারের পানে একবার চাহিয়া দেখিতেছে। সুধীর সমুদ্র দেখিতেছে।

সেই একদিন, সেই প্রথম সমুদ্র দর্শনের দিন, আর আজ। সুধীর একটী একটী করিয়া সেই অতীতের চিত্রগুলি উদ্‌ঘাটিত করিল দেখিল তাহার কত পরিবর্ত্তন। সে কি ছিল কি হইয়াছে। সুধীর প্রথম চিত্রখানি খুলিল, দেখিল, সুধীর আত্মহত্যা করিতে যাইতেছে। মুখ বিবর্ণ—প্রাণ পরিশূন্য—জ্ঞান তিরোহিত—চক্ষু দৃষ্টিহীন—সুধীর দেখিল সে চিত্র কি ভয়ঙ্কর। স্বর্ণদীর স্বর্ণকমলিনীরেণুপিঞ্জর মুক্তাধার ধারা ছাড়িয়া সে এই পঙ্ককলুষিত গোষ্পদে আসিয়া পিপাসা মিটাইতে আসিয়াছে। কুসুমাস্তরণ পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রামের আশায় এই কঠোর বন্ধুর শিলাশয্যায় আসিয়া আশ্রয় লইতেছে! পাছে পড়িয়া যাই বলিয়া স্বর্গভূমি পরিত্যাগ করিয়া এই শূন্যে আসিয়া শয্যা রচনা করিয়াছে! কি মোহ! কি ভ্রান্তি! সুধীর সে চিত্র আর দেখিলনা,

কখনও আর দেখিবেনা বলিয়া সুধীর তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। কিন্তু মনে মনে বড ভয় পাইল, আত্মহত্যায় পাপ আছে এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি?

সুধীর ভাবিল,—এখন প্রায়শ্চিত্তই বা আমার কি? আচ্ছা আগে বুঝা যাক্ আমার পাপ কি? আমার পাপ আমার অস্থিরতা, আর আশার আঘাতে স্থানচ্যুত হওয়া। অধৈর্য্যের ত' যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। এখন আশার—লোভের। চন্দ্র আকাশের, আমি পৃথিবীর, চন্দ্র সুধাকর, অবশ্য আমার জন্য নহে চন্দ্রের রূপ, তাহাও আমায় দেখাইবার জন্য নহে, তাহার জ্যোৎস্না—আকাশ বহিয়া তাহার এই জ্যোৎস্না, আমারই জন্য ছুটিয়া আসে না, তাহার হাসি, তাহাও যে আমারই তাহাও নহে। তা জানি, কিন্তু তবুও যেন মনে হয় উহা আমারই জন্য। তুমি যে ঐ নিরন্তরাল আকাশে আসিয়া দেখা দেও তাহা শুধু আমারই জন্য, তুমি যে তোমার সুধারাশি ছড়াইয়া দেও তাহা আমাকেই বাঁচাইবার জন্য, আর তোমার হাসি—তোমার রূপ, মনে করি উহাতে শুধু আমারই অধিকার। আমার পাপ শুধু এই লোভ। এখন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ইহার। আচ্ছা এ পাপের আঘাত পাইয়াই তো তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি, দেশে দেশে ঘুরিয়া এতদিন তাহার প্রায়শ্চিত্তই করিয়া আসিতেছি। অবশ্য তুমি তাহা জানি না। নাই জানিলে। তুমি তো ইহাও জান না—আমার কি পাপ। তা তোমার জানিয়াও কাজ নাই, জানাইতেও চাহিনা, জানাইবার অধিকার আছে কিনা, তাহাই বা কেমন করিয়া জানিব? আমি আর সে নাই, আমার আর লোভ নাই, আমার আর অধীরতা নাই, বুঝি আমার আর পাপও নাই। আমি এখন শুধু তোমায় ভালবাসি। তুমি যেখানে থাক, যাহারই হও, আমি তোমায় শুধু ভালবাসি—সুধীর চক্ষু মুদিয়া ভালবাসি।

তাহা জানি আমি, আর জানে আমার প্রাণ। জানিনা ইহাতে কোন পাপ আছে কিনা ?

সমুদ্রতীরে পাদচারণা করিতে করিতে সুধীর মনে মনে উষাকে জিজ্ঞাসা করিল,—উষা। বলিতে পার, ইহাতে কি আমার কোন পাপ আছে ?

একটী তরঙ্গ আসিয়া গড়াইতে গড়াইতে সুধীরের পায়ের কাছে বিলীন হইয়া গেল।

সুধীর তাহা দেখিল, ভাবিল,—তাই বটে। আমি সমুদ্রের তরঙ্গ, আমার গড়াইবার অধিকার আছে। তোমার সম্মুখে সমুদ্র, আমি উহার পদপ্রান্তে আছড়াইতে আছড়াইতে উহাতে মিশিব,আমার শুধু এখন ইহাই কামনা। আমার অপরাধ লইও না,আমি তোমার অজ্ঞাতে তোমায় ভালবাসিব। আমার আর কোন আশ্রয় নাই। তুমিই আমার প্রতিমা। তুমি নাই, জানিলে আমি তোমায় আমার হৃদয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া মহতো মহীয়ানের উপাসনা করিব। তুমি সঙ্কল্পিত, তোমার মূর্ত্তি আমার মনের মত করিয়া গড়িবার অধিকার আছে। তুমিই আমার আদর্শ, তোমার স্বচ্ছতায় দাঁড়াইয়া আমি দেখিব আমি সর্ব্বস্ব দান করিতে শিখিয়াছি কি না ?

অদূরে ভগবন্মন্দিরে শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সুধীর তাড়াতাড়ি প্রভুর সন্ধ্যারতি দেখিতে যাইল।
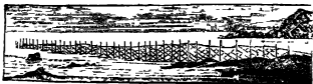
একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

তস্থিং নৈরাশ্যাদপি চ কলুষং বিপ্রিয়বশাদ
বিয়োগে দীর্ঘেঽস্মিন ঝটিতি ঘটনোত্তম্ভিতমিব।

দিনের পর দিন গিয়া আজ আষাঢ়ী পূর্ণিমা আসিয়াছে। রাত্রির পর রাত্রি গিয়া আজ আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাত্রি আসিয়াছে। দিনেরপর দিন, রাত্রিরপর রাত্রি, পৃথিবীতে চিরদিনই হইবে, আসিতেছে যাইতেছে, কে তাহার এত খবর লইয়া থাকে? তবে থাকে, থাকে না কি? থাকে, একটী মুহূর্ত্তেরও সর্ব্বাঙ্গসমুজ্জ্বল অবিকল মূর্ত্তিও প্রাণের ভিতর গ্রথিত হইয়া থাকে। সে কোন মুহূর্ত্তের! তাহার, যাহার শুভসম্মিলনে আমি পাষাণ—পাষাণের উপর পাষাণ হইয়া আমি পাহাড় হইয়া রহিয়াছি, শুষ্ক—কঠোর—সংসারে আমার আদর্শ নাই—আমিই অদ্বিতীয়, সেই আমার বুক চিরিয়া গঙ্গার স্রোত উথলিয়া উঠিয়াছিল, সে মুহূর্ত্ত আমি হিমালয় আমার বুকের ভিতর আজও গ্রথিত। সে মুহূর্ত্তকে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া আমি ধারাকারে পৃথিবীতে ছড়াইয়া রাখিয়াছি, তাহা কি আমার ভুলিবার! আর যাহার নির্দ্দয় আক্রমণে আমি সূর্য্য আমার সহস্র রশ্মি—আমার কত

বল—কত প্রতাপ—কত সৌভাগ্য—সব যাইল, কেহ আমায় রক্ষা করিতে পারিল না, আমি ডুবিলাম—আমি অস্তগমন করিলাম, সে মুহূর্ত্তও আমার প্রাণে গাঁথা। তা না হইবে কেন? ও সব মুহূর্ত্ত যে সজীব।

এই আজ আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাত্রি কেহ একবার হয়ত' ফিরিয়াও দেখিতেছেনা। নাই দেখুক, তাহাই ভাল। আমার অভিলষিতকে শুধু আমিই দেখিব, আর কাহারও বিলোল দৃষ্টিক্ষেপ দেখিলে আমার প্রাণ অপূর্ণ হইয়া উঠে। আমার বলিয়া আমার পূরা অধিকার, আমায় সে সুখে বঞ্চিত হইতে হইলে বড় কষ্ট হয়। তা তোমরা আর কেহ দেখিও না, এ রাত্রি আমার—এ পূর্ণিমা আমার—তা আষাঢেরই হউক বা যাহারই হউক পূর্ণিমাত' বটে? এ সেই পূর্ণিমা, সেই দিনের পূর্ণিমার রাত্রি—যে দিন শুনিলাম সুধীর দেশত্যাগী। সেদিনের সে সূর্য্যালোকসমুজ্জল দিবসকে আমি অনেক করিয়া থাকিতে বলিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম—তুমি আজিকার দিন। তুমি যাইও না। তুমি যাইলে সুধীরের অনেকক্ষণ চলিয়া যাওয়া হইবে, আমার ভাবনা বড় বাড়িবে তা তুমি যাইও না। দিবা কিন্তু তাহা শুনে নাই, দিবা চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পরই এই রাত্রি, এই পূর্ণিমার রাত্রি—এই প্রথম পূর্ণিমার রাত্রি—সমস্ত রাত্রি যাহার কিরণে কিরণে আমি বলিয়াছিলাম আমার কত কি। আমার সে রাত্রি প্রাণে গাঁথা। পূর্ণিমা ফুরাইলে আবার পূর্ণিমার আশায় বসিয়া থাকি। পূর্ণিমা আমার বড় আদরের। আজ আবার পূর্ণিমা আসিয়াছে। ইহা আমার।* আমি ইহাকে দেখিব। ইহা যে আমার হিমাদ্রিবক্ষের গঙ্গার ভাসিয়া যাইবার মুহূর্ত্ত, ইহা যে আমার প্রাণের অস্তগমনের মুহূর্ত্ত।

উমা প্রভুর স্নানবেদির একপার্শ্বে চন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া

বসিয়া আছে। সন্ধ্যা তাহার কোলে মাথা রাখিয়া একটু শুইয়াছে।

উষারা আজ কদিন হইল পুরুষোত্তমে আসিয়াছে। প্রাণ ভরিয়া জগন্নাথ দেখিতেছে।

যে কখন পুরুষোত্তমে গিয়াছে সে জানে পুরী কেমন, পুরীর মন্দির কেমন, মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বের চত্বরগুলি কেমন। যাইলে ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। কি প্রশস্ত, কি উদার, কি মনোহর, ভগবানের স্থানই বটে। তাহার উপর যদি চন্দ্রোদয় হয়, স্মিতসুভগ বিমল স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ আসিয়া যদি আবার হিমানীমণ্ডিত কৈলাসকূটের মত সেই সুধাধবলিত মন্দিরের উপর আছড়াইয়া পড়ে, আর তাহার রাশি রাশি শীকরকণার ন্যায় কিরণকণা আসিয়া সেই প্রশস্ত চত্বরে পুঞ্জীভূত হয়, তবে তাহা বুঝি পৃথিবীর নহে, মানুষের নহে, সত্য সত্যই ভগবানের।।।

তাহারপর স্নানবেদি। এইখানে স্নানযাত্রার সময় ভগবান্ আসিয়া স্নান করেন। সেই একদিন। তাই ইহার নাম স্নানবেদি। ইহা মন্দিরের কিছু তফাতে, কিন্তু প্রাচীরবেষ্টিত সেই প্রশস্ত সীমানার অন্তর্ভুক্ত। যাহাকে আনন্দবাজার বলে, যেখানে আপন পর ভুলিয়া—জাতিভেদ ছাড়িয়া দিয়া—এ ইহার মুখে, ও, উহার মুখে অন্নব্যঞ্জন তুলিয়া দেয়, স্নানবেদিতে যাইবার সেই পথ। সেখানে বড় একটা কেহ যায় না, স্থানটী বড় নির্জ্জন। বেশ প্রশস্ত, আবার কিছু উচ্চ, তায় আবার নির্জ্জন, তা তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী। আবার যদি তিথি পূর্ণিমা হয়, রাত্রির সার পূর্ণিমা রাত্রি যদি আপনার সর্ব্বস্ব তাহার উপর ছড়াইয়া দেয়, তবে তাহা প্রাণে গাঁথিবার, ভুলিবার নহে। একে রাত্রি, তার উপর জনকোলাহল দূরে, তায় চন্দ্র সম্মুখে, আর চন্দ্রকিরণসমুজ্জ্বল সমুদ্রের নীলাম্বুরাশি দৃষ্টিপথে একবার ফুটিতেছে একবার নিবিতেছে। এহেন সময় এহেন স্নানবেদি কি ভুলিবার!

· উষা সেই স্নানবেদির এক পার্শ্বে উপবিষ্টা। সন্ধ্যা তাহার কোলে।

উষা ডাকিল—দিদি।

দিদি বলিল,—কেন?

উষা বলিল,—কি বল দেখি?

দিদি বলিল,—বলিতে যে পারিনা তাহা নহে,তবে বলিয়া কি হইবে?

উষা ভাবিল,—তা বটে।

সন্ধ্যা বলিল,—উষা চল যাই।

উষা বলিল,—চল।

সন্ধ্যা কালবিলম্ব করিল না, একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিল। কেননা সে জানে উষার সঙ্গে গা ভাসান দিলে সমস্ত রাতই কাটিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা করিয়া কি হইবে? উষাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অন্যমনস্ক করাইত' দরকার।

সন্ধ্যা দাঁড়াইল। উষা বসিয়াই রহিল।

সন্ধ্যা উষাকে জানে, সে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল, একটু যে রাগ না করিল তাহাও নহে।

উষাও সন্ধ্যাকে জানিত, জানিত যে সন্ধ্যাই উষার অবলম্বন। বলিল,—দিদি।

সন্ধ্যা বলিল,—জানি, উষা!" জানি, এখন চল, রাত হ'য়েছে। সন্ধ্যা উষার হাত ধরিয়া যেমন বেদি হইতে নামিতে যাইবে এমন সময় এ কি। সন্ধ্যা স্তম্ভিত, উষা মোহিত!!।

এ কি। শুনিয়াছি আকাশ মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, আচ্ছা, তা যদি সত্য সত্যই পড়ে, তবে কি হয়? কোথায় দাঁড়াই? কি দেখি? কি ভয়ানক। তাও কি হয়? উষা বসিয়া পড়িল। সুধীর দিশা হারা হইল, সন্ধ্যা বেশ করিয়া আপনার চোখ মুছিল।

এ কি হইল ? কেহ কিছুই বুঝিতে পারিল না যে কোথা হইতে কি হইল ?

চকিতের পর চকিতের মত খানিকটা সময় কাটিয়া গেল, কেহ তাহা বুঝিল কেহ বুঝিল না। সন্ধ্যা বুঝিল, আর সুধীর কিছু কিছু বুঝিল, কিন্তু উষা কিছুই বুঝিল না। সর্ব্বাঙ্গশিথিলা উষার প্রাণের ভিতর আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সে চাহিতে পারিল না দেখিতে পারিল না, যে যাহা পড়িয়াছে তাহা শুধু আকাশ—ঘোর নীলিমাময় দূরদূরান্তরবিস্তারী শুধু শূন্য, কি তাহাতে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। উষার সাহস হইল না, উষা তেমনিই রহিল।

সন্ধ্যার অসীম সাহস। সন্ধ্যা সামলাইয়াছে। সন্ধ্যা আস্তে আস্তে সুধীরের নিকটে যাইল। বলিল,—সুধীর।

সুধীর কাট। ভাবিল,—এ কিসের ফল? ভাবনার? না সিদ্ধির? সুধীরের মনের ভিতর একবার বিদ্যুৎ বহিয়া গেল, সুধীর শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল,—আবার? আবার আশা? আবার সিদ্ধির আশা? তার যদি পথ না থাকে, তবে আবার কোথায় যাইব? আমার ভাবনাই ভাল।

সুধীর মন স্থির করিয়া উত্তর করিল,—দিদি। সুধীরও সন্ধ্যাকে দিদি বলিত।

সন্ধ্যা সুধীরের হাত ধরিল। এবার সন্ধ্যা কাঁদিতেছে। কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ধ্যা বলিল,—সুধীর।

সুধীর বলিল,—কেন দিদি। এবার সুধীরেরও গলাটা যেন কেমন কেমন।

সন্ধ্যা ডান হাতে সুধীরের হাত ধরিয়া আর বাঁ হাতে আপনার চোকের জল মুছিতে মুছিতে বলিল,—কেন? এখনও জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তোমার কি ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই? তোমার কি পাপ পুণ্য নাই?

সুধীর বলিল,—না দিদি! বুঝি নাই। আমি ঘোর পাপী পুণ্যে আমার অধিকার নাই, আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব।

"আইস, প্রায়শ্চিত্ত করিবে আইস" বলিয়া সন্ধ্যা উষার দিকে সুধীরকে টানিয়া আনিতে লাগিল।

সুধীর সহসা আর আশাকে স্থান দিতে চাহে না। বলিল,—এ কি? একি পরীক্ষা?

সন্ধ্যা ভ্রূকুটি করিল। বলিল,—নিদয়! সুধীর কাঁপিতে লাগিল। সন্ধ্যার ভ্রূকুটির ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে সুধীর দেখিতে পাইল তাহার পাপ কত!!! তখন অজ্ঞানের মত ছুটিয়া গিয়া উষার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সুধীর ডাকিল উষা!

শুধু এক বিন্দু সুধাকণার জন্য যাহার কণ্ঠস্থল মরু, সেই ক্ষুদ্রাভিলাষিণী চকোরীর কণ্ঠে ঐ পরিপূর্ণকান্তি চন্দ্রমণ্ডল আসিয়া ছিড়িয়া পড়িল, চকোরী অজ্ঞান হইয়া পড়িল!!!

পরিশিষ্ট।

সন্ন্যাসী ধরা পড়িয়াছেন। জগদীশ্বর ও জগদীশ নাথ তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিয়াছেন যে তিনি মুদেব, সুধীরের পিতা। সন্ন্যাসী আর তাঁহাদের হাত এড়াইতে পারিলেন না। তিনিও সুধীরের মত পুত্ররত্ন পাইয়া আবার গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে আপত্তি করিলেন না।

সুধীরের আর আনন্দ ধরে না। সুধীর বিধাতার কার্য্যে বৈচিত্র্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছে, সে অমন করিয়া না বাহির হইলে বুঝি পিতাকে পাইত না।

উষার সহিত সুধীরের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহ ঐ পুণ্যক্ষেত্রেই হইয়াছে। সন্ধ্যাকে দেখিলেই উষা এখন পালায়।

সন্ধ্যা সুধীরের নাম রাখিয়াছে রামলক্ষণ। সুধীরের সে নামটী বড় মিষ্টি লাগে।

জগদীশ্বর প্রভৃতি মুকুন্দদেবও রাজা মানসিংহের আজ্ঞানুসারে আপনার দেশে গিয়াছেন।

বলদেবাচার্য্য সুধীরের কোন সন্ধান না পাইয়া আর একবার দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইচ্ছা সুধীর যদি না আসিয়া থাকে তবে গৃহধর্ম্মের নিকট চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়া যাইবেন, কিন্তু তাঁহাকে আর তাহা করিতে হইল না।

প্রবল ঝটিকা ঝঞ্ঝাবাতের পর আবার মৃদু মন্দ সমীরণ বহিল। রামচন্দ্রপুরে আবার শান্তি সংস্থাপিত হইল। এক খানি গ্রাম যেমন একটী শান্তিময় সংসার ছিল আবার তেমনি হইল।

দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া সকলে ঠিক করিল,—

ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

সমাপ্ত।